وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH

নূরুদ্দীন
NURUDDIN

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Jamia Ahmadiyya Bangladesh

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নুরুদ্দীন

NURUDDIN

2017

Jamia Ahmadiyya Bangladesh

নূরুদ্দীন
NURUDDIN
বর্ষ ৮ ▣ সংখ্যা ১ ▣ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের মুখপত্র

সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি
মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সম্পাদক
মাসুম আহমদ

নির্বাহী সম্পাদক
ইয়াছিন আহমদ

সহকারি সম্পাদক
সুলতান মাহমুদ আনোয়ার

তথ্য সম্পাদক
সৈয়্যদ মুজাফ্ফর আহমদ

সার্বিক সহযোগিতায়
মোহাম্মদ আল হক
রশিদ আহমদ

ছাত্র প্রতিনিধি
সাব্বির আহমদ মুত্তাকী
সজীব আহমদ
মসীহ্ উর রহমান

প্রকাশক
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
Phone: +88 02 7300428, Fax: +88 02 7301854
e-mail: jamia.bd2006@gmail.com

মুদ্রণে
ইন্টারকন এসোসিয়েটস, ৪৫-এ নিউ আরামবাগ, ঢাকা

সূচিপত্র

৪ কুরআন
৫ হাদীস
৬ অমৃত বাণী
৭ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা
মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
১২ আউয়ালীন ও আখারীনদের জন্য ২৭ মে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক
আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
১৬ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা
মাওলানা মাসুম আহমদ
২০ সাহিত্য সংস্কৃতি ও মহানবী (সা.)
মাওলানা ইয়াছিন আহমদ
২৪ সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার প্রেক্ষাপট
মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
২৭ নারী মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
অনুবাদ: মাওলানা রশিদ আহমদ
৩১ হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা
মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
৩৫ রসূল করীম (সা.)-এর কুরআন প্রেম
মাওলানা মোহাম্মদ আল হক
৩৮ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়া কবুলিয়্যতের কিছু ঘটনা
মাওলানা নাসের আহমদ
৪৯ রসূল অবমাননার শাস্তি
মাওলানা নাভিদুর রহমান
৫২ দাঈ ইলাল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
সাব্বির আহমদ, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ
৫৬ সন্তানের তালিম-তরবিয়তে হযরত মুহাম্মদ (সা.)
মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
৬০ প্রশংসিত মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)
সাকিবুল হাসান, ছাত্র: ৫ম বর্ষ
৬৩ মিরাজ ও ইসরা
আবু সালেহ্ আহমদ, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৭৩ বিশ্ব নবীর (সা.) সত্তায় আরোপিত আপত্তির অপনোদন
মসীহ্ উর রহমান, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ
৭৭ শাক্কুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ) মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি অনন্য মো'জেযা
মেহেদী সুলায়মান, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৭৯ আমার জামেয়াতে আসার অনুভূতি
মুহাম্মদ সামিউল ইসলাম, ছাত্র: ১ম বর্ষ
৮০ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বাৎসরিক কার্যক্রম
মোহাম্মদ মোমিন হোসেন, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ
৮২ জামেয়ার দৈনন্দিন কর্মকান্ড
সফিক আহমদ চৌধুরী, ছাত্র: ৩য় বর্ষ
৮৪ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিবেদন-২০১৬
মাসুদ আহমদ, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ
৮৬ শিক্ষা সফর - ২০১৬
সজীব আহমদ, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ
৮৯ ঘুরে এলাম পবিত্রভুমি কাদিয়ান
চৌধুরী মারুফ আহমদ, ছাত্র: ৭ম বর্ষ
৯৪ The Comforter has come: invitation to our Christian brothers and sisters
Abdul Awwal Khan Chowdhury

সম্পাদকীয়

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতিক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির ৩৫:২৯)

আসলে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জানে না তারা আল্লাহকে কী ভয় করবে। অতএব, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে যত বেশী জানেন তারা তত বেশী আল্লাহ্কে ভয় করেন।

অপর দিকে এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না তারা আলেম বা জ্ঞানী হবে না। আল্লাহকে যারা ভয় করেন তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। আবার বলা হয়েছে-

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ
بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

(হে রসূল!) তুমি কেবল তাকে সতর্ক করতে থাক যে উপদেশ মেনে চলে এবং অদৃশ্যেও রহমান খোদাকে ভয় করে। (সূরা ইয়াসিন :১২) অর্থাৎ আলেম সেই হবে যে উপদেশ মেনে চলবে এবং পরম করুণাময় খোদাকে ভয় করে চলবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চেয়েছেন আমাদের জামাতে যেন অনেক রূহানী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী আলেম সৃষ্টি হন। এই লক্ষ্যেই জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

হযরত নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবা কেরাম (রা.) সম্পর্কে বলেছেন :

اَصْحَابِی کَالنُّجُوْمِ بِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ

অর্থাৎ আমার সাহাবা (রা.) আকাশের নক্ষত্রের মত (জ্যোতির্ময়)। তাদের যে কোন একজনকে অনুসরণ কর হেদায়াত পেয়ে যাবে। অর্থাৎ সাহাবা (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর আলোতে আলোকিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদেরকে নক্ষত্র বলা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাশ্ফে দেখেছেন :
"আমি দেখলাম, রাতের সময় আমি একস্থানে বসে আছি। আমার পাশে একজন আছেন। আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম অসংখ্য তারকারাজি একত্রে জমা হয়েছে। আমি ঐ তারাগুলোর দিকে দেখে এবং সেদিকে ইঙ্গিত করে বললাম 'আসমানী বাদশাহাত' (ঐশী রাজত্ব)।

আমি এর তা'বীর (ব্যাখ্যা) করেছি। ঐশী রাজত্বের অর্থ 'আমার জামাতের বুযুর্গবর্গ',যাদের আল্লাহ্ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিবেন'। (তাযকেরা পৃষ্ঠা: ৫৭৫, সংস্করণ ২০০৫)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জানিয়েছেন, তিনি আহমদীয়া জামাতে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রূহানী আলেম বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী সৃষ্টি করবেন। অতএব, জামাতে আহমদীয়া থেকে পাশ করা মুরুব্বী ও মোবাল্লেগকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত রূহানী উলামা হওয়া তাদের মূল লক্ষ্য। জামাতের উন্নতি হবে তাদের হাতে যারা রূহানী আলেম হবেন।

হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন খলিফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন:
'জামাতের মাঝে ধর্মকে পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দানকারী ব্যক্তিদের প্রয়োজন। দ্বীন ও দুনিয়া যখন সামনে আসবে তখন সংসারের প্রতি দৃষ্টি দিবে না। বড় সাহসী উপদেশদানকারী দরকার যারা আন্তরিকতা সহকারে পূণ্যের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিবেন। যারা পরকালের চিন্তা রেখে কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করবেন। দোয়ার উপরে বিশ্বাস রাখবেন, নিজ জ্ঞানের অহংকার করবেন না এমন আলেম দরকার। যারা চিন্তামগ্ন থাকেন যে, কিভাবে আল্লাহ্ খুশী হবেন। এমন গুণসম্পন্নমানুষ কম দেখা যায়।...' (হায়াতে নূর, পৃ. ৪০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন:
"আমি চাই, আমাদের মাঝে এমন মানুষ থাকুন যারা প্রত্যেক ভাষা শিখবেন এবং জানবেন যেন প্রত্যেক ভাষায় তারা সহজেই তবলীগ করতে পারেন। এ বিষয়ে আমার অনেক বড় বড় ইচ্ছা ও পরিকল্পনা আছে..."।

"আমার মতে জামেয়ার সাফল্যের জন্য ছাত্রদেরকে জামেয়ার হোস্টেলে অবস্থান করা উচিত। কারণ সঠিক চরিত্র গঠনের এবং ধর্মসেবার উদ্দীপনা সৃষ্টির এটিই সময়। ...এখানে থেকে তারা নেকী ও তাকওয়ার পথে উন্নতি করবে। ...আমার অভিজ্ঞতা এটিই। আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, জামাতের বিরোধীদের মোকাবেলায় জ্ঞানের মাধ্যমে বিজয় লাভ হয় না; বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে বিজয় লাভ করা যায়। একজন মানুষ যখন আল্লাহ্র দিকে অবনত হয় তখন তিনি স্বয়ং তাকে জ্ঞান দান করেন"। (আন্ওয়ারুল উলুম ২য় খণ্ড, মান্সাবে খিলাফত; পৃ. ৩৫)

হযরত (রা.)-এর কথার অর্থ এই যে, বিরোধীরা জ্ঞানের কথা শোনে না, হয়তো বোঝেও না বা মানেও না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে সব জ্ঞানগর্ভ বইগুলো লিখেছেন তা পড়লে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। অতএব, দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করতে হবে।

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামেয়া পাশ মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন :
"আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে দু'ধরনের আলেমদের উল্লেখ করেছেন। এক আহমদী আলেম যারা আল্লাহ্র ফজলে আহমদী আলেম হয়েছেন, যারা আল্লাহকে সর্বদা ভয় করেন। কুরআন করীম পড়েন। মনোযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেন। কুরআনী শিক্ষার উপর আমল করেন আর অন্যদেরকেও আমল করান। নামায কায়েম করেন। আল্লাহ্ তা'লা যে রিযক্ প্রদান করেছেন তা থেকে খরচ করেন। রিয্ক বলতে কেবল টাকা পয়সাকেই বোঝায়না বরং জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতাও রিয্ক যা আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে দিয়েছেন। এর সঠিক প্রয়োগ করে জামাতের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটি আপনাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এরা এমন মানুষ যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী। এরা এমন মানুষ যারা এমন আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত যারা হাকীকী উলামা। সুতরাং জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞানীদের সারিতে শামিল হতে আপনার মাঝে একটি বিশেষ গুণের সৃষ্টি হওয়া উচিত যা হলো বিনয়"।

হুযুর (আই.) আরো বলেছেন :
"এবং সবচেয়ে বড় বিষয় এই যে, আপনাদের আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। তারপর সে সম্পর্ক বৃদ্ধি করেই যেতে হবে। নামায অর্থাৎ নফল নামাযের কথা বলছি। দোয়া করতে হবে। দোয়ার স্বাদ পেতে হবে। অভ্যাস করুন। দরূদ পাঠ, যিক্রে ইলাহীর প্রতি দৃষ্টি রাখুন। আর যদি এমন হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে হবেন, ইনশাআল্লাহ। তখন আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতিও হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর আপনি একজন কল্যাণকর মুরুব্বী ও মুবাল্লেগ হতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'লা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে সফলতা দান করবেন। আল্লাহ্ করুন আপনি সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করুন যা আপনার কাছে আশা করা হয়েছে। আপনি সর্বদা খিলাফতের জন্য সুলতানে নাসীর (সুলতানান নাসীরা- শক্তিশালী সাহায্যকারী) হবেন।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে যুগ খলিফার পক্ষে সুলতানে নাসীর হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

কুরআন

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অনুবাদ

নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত নাযেল করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ এবং অনেক সালাম পাঠাও।

[সূরা আহযাব : ৫৭]

يَا رَبِّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّكَ دَائِمًا
فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا وَ بَعْثٍ ثَانِ

'ইয়া রাব্বি সাল্লি আলা নাবিয়্যিকা দা-ইমান
ফী হা-যিহিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়া বা'সিন সানী'

হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ইহকালে ও পরকালে সদা সর্বদা তোমার দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। –*হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)*

[আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৯৪]

হাদীস

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ
فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ

অনুবাদ

হযরত সা'দ বিন হিশাম (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-র নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর (রা.) নিকট নিবেদন করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বললাম কেন নয়? অবশ্যই পড়ি (হে উম্মুল মু'মিনীন!)। তখন তিনি (রা.) বললেন 'তাঁর (সা.) চরিত্র তো ছিল কুরআন!'।

[মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত]

অমৃত বাণী

”وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا۔ نجوم میں نہیں تھا۔ قمر میں نہیں تھا۔ آفتاب میں بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا۔ وہ لعل اور یاقوت اور زمرّد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا۔ غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا۔ صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں، جس کا اتمّ اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سیّد و مولیٰ سیّد الانبیاء سیّد الاحیاء محمّد مصطفیٰ ﷺ ہیں“

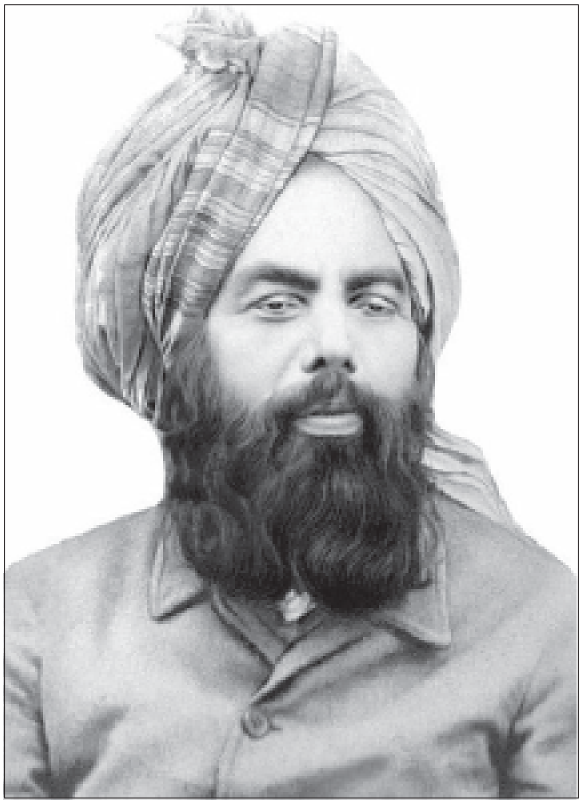

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

‘সেই যে সর্বোচ্চ স্তরের নূর (আলো) যা ইনসানকে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ইনসানে কামেলকে (পূর্ণ-মানবকে) দেওয়া হয়েছে। যা ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, যা পৃথিবীর সমূদ্রগুলোতে ছিল না, নদী সমূহে ছিল না, ছিল না মুক্তো মানিক্যে, পান্নাতে আর মোতিতেও , তা ছিল কেবল ইনসানের মধ্যে অর্থাৎ ইনসানে কামেলের মধ্যে। যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন- আমাদের নেতা ও প্রভু, নবীগণের নেতা অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা -
মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ।’

[আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৬০, ১৬১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান মর্যাদা

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নাম

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ কর্তব্য পালন করেছে আর যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযেল হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছে।" [সূরা মুহাম্মদ : ৩]

হযরত নবী করীম (সা.)-এর নামের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য প্রকাশিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম মুহাম্মদ আল্লাহ তা'লা রেখেছেন। মুহাম্মদ অর্থ 'প্রশংসিত'। আল্লাহ তা'লা রহমান। রহমানের তাজাল্লিয়াতে (ঐশী বিকাশে) মুহাম্মদ (সা.)-এর সৃষ্টি। আল্লাহ্ প্রশংসাকারী আর মুহাম্মদ (সা.) প্রশংসিত। কত বড় বিষয়! আল্লাহ প্রশংসা করেছেন বলেই মুহাম্মদ (সা.) প্রশংসিত বা মুহাম্মদ হয়েছেন। কুরআন শরীফে অনেক আয়াত আছে যেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উচ্চ মর্যাদার কথা বড় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহর ও পরকালের সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে অনেক স্মরণ করে। [সূরা আহযাব : ২২]

হুযুর (সা.) আমাদের জন্য যে উত্তম আদর্শ বা নমুনা রেখে গেছেন, আমল করে দেখিয়েছেন আমরা যদি তা অনুকরণ করি তাহলেই যথেষ্ট। আমাদের এমন কিছু করার প্রয়োজন নেই যা হুযুর (সা.) করেন নি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "আমি তোমাদের বলতে চাই, অনেক মানুষ আছে যারা নিজেরা যিকর রচনা করেছে, বিভিন্ন ওজিফা বা যিকর রচনা করেছে, তারা তাদের সেসব যিকরের মাধ্যমে রূহানী উন্নতি করতে চায়। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হুযুর (সা.) যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি তা অযথা ও অতিরিক্ত। মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বড় আল্লাহর নেয়ামত লাভের সত্যিকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আর কে হতে পারে। মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন। অতএব তিনি যে পথ অবলম্বন করেছেন সেই পথই সর্বোত্তম, সবচেয়ে বেশি সঠিক এবং আল্লাহর নিকটের পথ। আঁ-হুযুর (সা.)-এর পথকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করা তা বাহ্যত যত চমৎকারই হোক না কেন আমার মতে ধ্বংসের পথ। আল্লাহ তা'লা আমার কাছে এমনটিই প্রকাশ করেছেন।"

"আঁ-হযরত (সা.)-এর সঠিক অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যায়। হুযুর (সা.)-এর অনুসরণ না করে যদি কেউ সারাজীবন সিজদা করে জীবন কাটায় তবুও সে কোন উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। ...আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করো না। ...আল্লাহ তা'লা আঁ-হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, "লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ" হুযুর (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করো। একবিন্দুও এদিক সেদিক হতে চেষ্টা করো না।"

'সাহাবায়ে কেরামের জামাত এমন একটি জামাত ছিল যা কখনো হুযুর (সা.)-এর থেকে আলাদা বা পৃথক হতেন না। হুযুর (সা.)-এর পথে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না বা করেন নি।"
(তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ(আ.), ৩য় খন্ড, পৃ-৩৯)

মহানবী (সা.)-কে আল্লাহর প্রতিনিধি বানানো হয়েছে। মানুষকে বলা হয়েছে তোমরা মহানবী (সা.)-এর রঙে নিজেকে রঙ্গীন করো তাহলে আল্লাহর রহমত লাভ করবে।

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

অনুবাদ: (তিনি) (সা.) আল্লাহর দিকে আল্লাহর নির্দেশে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান সূর্যের মত এবং মুমিনদের সু-সংবাদ দিয়ে দাও (এই) যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় ফযল (অনুগ্রহ)। [সূরা আহযাব : ৪৭-৪৮]

অর্থাৎ যারা আঁ-হযরত (সা.)–এর প্রতি ঈমান আনবে তারা সবাই হুযুর (সা.)-এর থেকে নূর পাবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন-
"এক গ্রামে এক বাড়ি ছিল এবং কেবল ঐ বাড়িতেই একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল। যখন মানুষ জানতে থাকল তখন তারা নিজেদের প্রদীপ নিয়ে ঐ বাড়িতে গেল এবং প্রত্যেকে নিজেদের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে গেল। এভাবে সকলের বাড়ি আলোকিত হয়ে গেল। এভাবে একটি প্রদীপ থেকে বহু প্রদীপ জ্বলতে পারে। (উপরোক্ত আয়াতে এটিকেই নির্দেশ করা হয়েছে [তিনি (সা.)] আল্লাহর আদেশে সকলকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং সিরাজাম মুনীরা আলোকিত সূর্যের মত।"

"আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহানী (আধ্যাত্মিক) সংশোধন বা তরবিয়তের জন্য যারা মনোনীত হন তাঁরা প্রদীপের মত হয়ে থাকেন। এজন্য আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে আঁ-হযরত (সা.)-এর নাম 'দা'ঈয়ান ইলাল্লাহ' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' রেখেছেন। দেখ! কোন অন্ধকার বাড়িতে পঞ্চাশ বা একশ মানুষ থাকে এবং তাদের কোন ব্যক্তির কাছে যদি প্রদীপ থাকে তাহলে সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ঐ প্রদীপ সকল অন্ধকারকে দূর করে দিবে এবং সবাইকে আলোকিত করবে।" [তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৪]

একদিন সারা পৃথিবীর মানুষ সকল দেশের মানুষ নবী করীম (সা.)-এর আলোয় আলোকিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল ও নবীগণের মোহর। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। [সূরা আহযাব : ৪১]

সোজা-সরল ভাষায় অনুবাদ এরকম, তিনি কোন পুরুষের পিতা নন। কিন্তু আল্লাহর রসূল হওয়ার কারণে সকল মু'মিন-মুসলমানের আধ্যাত্মিক পিতা। সূরা আহযাবেরই আয়াত নাম্বার ৭ দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে রসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ তোমাদের মা। অতএব, রসূলুল্লাহ (সা.) মু'মিন-মুসলমানের পিতা। তারপর তিনি 'খাতামান্নাবীঈন'। তথা নবীগণের পিতা।

খাতামান্নাবীঈন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সকল অর্থে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করে। যতগুলো অর্থ করা সম্ভব সকল অর্থেই আমরা হুযুর (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি। দেখুন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ মাওউদ (আ.) কী বলেছেন:

"আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহা পাপী ব্যক্তির কাজ, আল্লাহ আমাকে মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) রূপে পাঠিয়েছেন।" (একটি ভুল সংশোধন, পৃ. ৯-১০)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আরো বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধে এবং আমার জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে বিশ্বাস করি না। এটি আমাদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট মিথ্যা রচনা করা হয়েছে। আমরা এত বেশি জোরালোভাবে, দৃঢ় বিশ্বাস, মারেফত ও বাছিরাতের সাথে আঁ-হযরত (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন বলে মান্য করি ও বিশ্বাস করি যে, এর লক্ষ ভাগের একভাগও তারা বিশ্বাস করে না।" (আল হাকাম, ১৭ মার্চ ১৯০৫ খ্রি.)

হুযুর (আ.) বলেছেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন।' [সূরা আহযাব: ৪১]

এটি স্পষ্ট যে, 'লাকিন' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দটি আরবি ভাষায় বাক্যের প্রথমাংশে বর্ণিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরিকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ব্যাকরণে যাকে 'ইস্তেদরাক' বলা হয়)। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে মহানবী (সা.)-এর পবিত্রতম সত্তায় যে ত্রুটি ও বিচ্যুতিমূলক নেতিবাচক বিষয়টির নিরূপণ করা হয়েছে তা হল দৈহিকরূপে তাঁর কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পিতা না হওয়া। অতএব, বাক্যের শেষাংশে 'লাকিন' শব্দের দ্বারা সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নেতিবাচক বিষয়টির প্রতিকার ও অপনোদন করে আঁ-হযরত (সা.)-কে 'খাতামান্নাবীঈন' সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাঁর পরে প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে নবুওয়্যত লাভের ধারা চিরতরে রুদ্ধ ও ছিন্ন হয়েছে। এখন নবুওয়্যতের পরিপূর্ণ কল্যাণ কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই পেতে পারেন যিনি নিজের সকল আমল বা কর্মের উপর তাঁর (সা.) নবুওয়্যতের আনুগত্য ও অনুবর্তিতার মোহর রাখবেন এবং এইরূপে যিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর রূহানী পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারী হবেন। (রিভিউ বর মোবাহাসা বাটালবী ও চকড়ালবী, পৃ. ৬-৭)

হুযুর (আ.) আরো বলেন,

"এরূপ হতভাগ্য মিথ্যে দাবিকারক ব্যক্তি যে নিজে রিসালত ও নবুওয়্যতের দাবি করে সে কি কুরআন শরীফে ঈমান রাখতে পারে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে ঈমান রাখে এবং "ওয়া লা-কির রাসূলাল্লাহে ওয়া খাতামান্নাবীঈন" আয়াতকে খোদার কালাম বলে দৃঢ়বিশ্বাস করে সে কি বলতে পারে যে, সে-ও আঁ-হযরত (সা.)-এর পরে নবী ও রাসূল? ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অধম কষ্মিনকালেও মৌলিকভাবে (তথা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ণ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে এবং স্বাধীন ও সতন্ত্রভাবে- অনুবাদক) নবুওয়ত বা রিসালতের দাবি করেনি।"
(আন্জামে আথম, পৃ. ২৭-২৮ পাদটিকা)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,

"যখন আমরা ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিতে দেখি, তখন নবুওয়্যতের সমগ্র সারিতে সর্বোচ্চ স্তরের দৃঢ়সংকল্প প্রিয় নবী হিসেবে কেবলমাত্র জানতে পারি অর্থাৎ সেই নবীগণের নেতা ও অধিনায়ক, রসূলগণের গৌরব ও মুকুট, যাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তফা ও আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যাঁর ছায়ায় দশদিন কাটালে সেই আলো পাওয়া যায় যা ইতোপূর্বে হাজার বছর কাটালেও পাওয়া যেতো না।"
(সিরাজে মুনীর, পৃ. ৮২)

হুযুর (আ.) আরো বলেছেন, "মোটকথা, আমাদের ধর্মমত হচ্ছে এই, যে ব্যক্তি মৌলিক অর্থে নবুওয়্যতের দাবি করে এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর রূহানী বরকত ও কল্যাণের আঁচল থেকে নিজেকে পৃথক রেখে এবং হুযুর (সা.)-এর পবিত্র উৎস হতে আলাদা হয়ে নিজেই নিজেকে সরাসরি আল্লাহর নবী বনে যেতে চায় সে মুলহেদ ও বেদ্বীন (বিধর্মী) বৈ কিছু নয়।"
(আন্জামে আথম, পৃ. ২৭ পাদটিকা)

অনেক বড় প্রশ্ন এই যে, হযরত ঈসা (আ.) একজন বনী ইসরাঈলী নবী। তিনি জীবিত আছেন। তিনি যখন আসবেন তখন শেষ নবী কে হবেন? এটি কি সম্ভব! হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার বিষয়টি আমাদের ও অন্যদের মধ্যে বিতর্কের মূল বিষয় না। পৃথিবীর সকল মুসলমান যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে আমরাও সেভাবেই বিশ্বাস করি। তারাও হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আগমনে বিশ্বাস করে, আমরাও হযরত ঈসা (আ.)-এর পুণরায় আগমনে বিশ্বাস করি। তারা হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-এর আগমনে বিশ্বাসী হয়েও হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করে। এতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না। তারা বলছে, হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন। আমরাও বলছি হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন। তারা বলছে, হযরত ঈসা (আ.) শুধুমাত্র উম্মতি হয়ে আসবেন, নবী হবেন না। এখানেই তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য। আমরা বলছি হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি হয়ে আসবেন এবং নবীও হবেন। নবুওয়ত হারাবেন না। কারণ কুরআন শরীফে তাঁকে নবী বলা হয়েছে। কুরআন পরিবর্তন করা সম্ভব না। অতএব হযরত ঈসা (আ.) নবীও হবেন এবং উম্মতিও হবেন। যখন হযরত ঈসা (আ.) এসে হাজির হবেন তখন কে বলবে যে, তিনি নবী নন?

আমরা বিশ্বাস করি হযরত মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.) মারা গেছেন। তিনি স্বশরীরে আর আসতে পারেন না। তিনি যদি আসেন তাহলে শেষ নবী কে হবেন? আমরা বিশ্বাস করি ঐ ঈসা (আ.) আসবেন না। এখন রূহানীভাবে ঈসা (আ.)-এর গুণে গুণান্বিত হয়ে একজন জন্ম নিবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতি হবেন। উম্মতি হয়ে নবুওয়ত প্রাপ্ত হওয়াতে খতমে নবুওয়্যতের মোহর ভঙ্গ হয় না। কুরআন ও হাদীসে কোথাও এ কথা লেখা নাই যে, হযরত ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার যখন আসবেন তখন তিনি নবী হবেন না। **বরং কুরআন, হাদীস এবং অন্য আলেমদের বইতে লেখা আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) উম্মতি নবী হয়ে আসবেন**। যেমনঃ

১. সহীহ বুখারীতে দেখুন, ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযেল হবেন তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন।

২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ দাজ্জাল হাদীসে দেখুন, হযরত ঈসা (আ.)-কে চারবার **'নবীউল্লাহ'** বলা হয়েছে।

৩. সহীহ বুখারী শরীফে ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছেঃ "হাকামান আদালান-নেতৃত্ব ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরীয়তের বাহকরূপে হবে না বরং **তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকবেন বটে, কিন্তু তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালাকারী এবং সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচার দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠারূপে আগমন করবেন।**" (বুখারী শরীফ, বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা, চতুর্থ খন্ড, পৃ. ৪১৭ অনুবাদক : মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) এবং মাওলানা আজিজুল হক সাহেব-শায়খুল হাদীস জামিয়া রহমানিয়া সাত মসজিদ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।)

৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন,

فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَ لَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَاِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ

অর্থাৎ যখন তোমরা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংবাদ পাবে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে বয়াত

গ্রহণ করবে, (এজন্য) যদি তোমাদের বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় (তবুও যাবে) কারণ তিনি **'আল্লাহর খলীফা আল মাহদী'**। (ইবনে মাজাহ, বাব খুরুজুল মাহদী)। এখানে খলীফাতুল্লাহ অর্থ নবী আল মাহদী অর্থ অনুসারি বা উম্মতি। কোন আলেম একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে, খলীফাতুল্লাহ অর্থ নবী। বিগত ১৩০০ বছর ধরে অনেক উলামায়ে কেরাম লিখে আসছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) যখন পুনরায় আসবেন তিনি নবী হয়েই আসবেন। কোথাও লিখা হয়নি যে, হযরত ঈসা নবী হবেন না।

৫. হযরত আয়েশা (রা.), যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন যে অর্ধেক দ্বীন আয়েশার নিকট শেখো, বলেন–

৬. قُوْلُوْا اِنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَآءِ وَ لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

'তোমরা আঁ-হযরত (সা.)-কে খাতামুল আম্বিয়া বল কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নাই।' (তফসীর দুররে মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃ. ২০৪)

৭. হযরত ইমাম মুহাম্মদ তাহের, প্রখ্যাত মুহাদ্দেস, বলেছেন- "হযরত আয়েশা (রা.) একথা এজন্য বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। তাছাড়া হুযুর (সা.)-এর হাদীস-'লা নাবীয়্যা বাদী'র অর্থ হচ্ছে শরীয়তধারী কোন নবী আসবেন না।" (তাকমেলা মজমাউল বিহার, পৃ. ৮৫)

৮. আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউতি (রহ.), তফসীর জালালাঈন-এর লেখক, ৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দেদ বলেছেন,

مَنْ قَالَ بِسُلْبِ نَبُوَّتِهِ فَقَدْ كَفَرَ كَمَا حَقًّا صَرَفَ بِهِ السُّيُوْطِى

"যে ব্যক্তি বলবে হযরত ঈসা (আ.) নবী হবেন না সে কাফের হবে।" (হুজাজুল কেরামাহ, পৃ. ৪৩১)

৯. হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) বলেছেন, "হযরত ঈসা (আ.) আমাদের মধ্যে আগমন করবেন; তিনি নিঃসন্দেহে নবী হবেন।" অর্থাৎ উম্মতি নবী। (ফতুহাতে মাক্কিয়া, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭০)

এই ধরনের বহু আলেমগণের বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। আরো অনেক হাদীসও পেশ করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো যারা বলেন যে, হযরত ঈসা যখন আসবেন তিনি নবী হবেন না কেবলমাত্র উম্মতি হবেন; নবী হবেন না একথা তারা কিসের ভিত্তিতে বলেন? এমন কথা কে বলেছে? কিভাবে একথা বলা সম্ভব? যেখানে কুরআন শরীফে বহু আয়াতে লেখা আছে যে, তিনি বনী ইসরাইলী নবী ছিলেন। কেউ তাঁর নবুওয়ত কেড়ে নিতে পারবে না। অতএব, ঐ দুই হাজার বছর পূর্বে যার জন্ম, সেই ঈসা (আ.) স্বশরীরে আসতে পারেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,
"আমি দৃঢ় বিশ্বাস এবং দাবীর সাথে বলছি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর খতমে নবুওয়্যতের কামালাত (বৈশিষ্ট ও গুণাবলী) শেষ (চূড়ান্ত সীমায় উপনীত) হয়েছে। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারী যে তাঁর বিপরীতে আলাদা কোন সিলসিলাহ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর নবুওয়ত হতে পৃথক হয়ে আলাদা কোন সত্য পেশ করে এবং মুহাম্মদী নবুওয়্যতের উৎসকে ত্যাগ করে। আমি খোলাখুলি ভাবে বলছি যে, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর খতমে নবুওয়তকে ভঙ্গ করে। এ কারণেই এরূপ কোন নবী আসতে পারে না যার উপর মুহাম্মদী নবুওয়্যতের মোহর না থাকে।"
(আল হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৫ খ্রি.)

"খোদা তা'লা যেখানেই এই অঙ্গীকার করেছেন যে, মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন, সেখানে এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, এই মহিমান্বিত রসূল (সা.) স্বীয় পূর্ণতম আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে ঐ সকল সাধু ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের জন্যে পিতার মর্যাদা রাখেন, যাঁদের পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিকাশ তাঁরই অনুবর্তিতার মাধ্যমে সাধিত হয় এবং তাঁদেরকে ঐশী বাণী ও ঐশী বাক্যালাপে ভূষিত করা হয়।" (রিভিউ বার মুবাহাসা বাটালভী ও চকড়ালভী, পৃ:৬-৭)

"অতএব, উক্ত অর্থে খোদা তা'লা তাঁকে খাতামান্নাবীঈন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, কিয়ামত পর্যন্ত নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হলো, যে ব্যক্তি সত্যিকার আনুগত্য ও অনুবর্তিতার দ্বারা নিজের উম্মতি হওয়া প্রমাণিত না এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুগমনে নিজের সমস্ত সত্তাকে বিলীন না করে এইরূপ ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত না কোন পরিপূর্ণ ওহী (ঐশী-বাণী) লাভ করতে পারবে, না পূর্ণ ইলহামপ্রাপ্ত হতে পারবে। কেননা, 'মুস্তাকিল' (অর্থাৎ অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে সরাসরি- স্বাধীন ও স্বতন্ত্র) নবুওয়ত মহানবী (সা.)-এর উপরে নিঃশেষ হয়ে গেছে; কিন্তু 'যিল্লি' (প্রতিবিম্ব) নবুওয়ত- যার অর্থ এই যে, কেবলমাত্র মুহাম্মদী ফয়েয ও কল্যাণের দ্বারা ওহী পাওয়া- তা কিয়ামতকাল ব্যাপী অব্যাহত ও সচল থাকবে, যাতে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের দ্বার রুদ্ধ না হয় এবং যাতে এ চিহ্নটি দুনিয়া থেকে মুছে না যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উচ্চ সাহস ও উদ্যম কিয়ামত কাল ব্যাপী এটিই চেয়েছে যে, ঐশী-বাণীর ('মুকালামাত ও মুখাতাবাতে ইলাহীয়া'র) দুয়ার খোলা থাকুক এবং ঐশী তত্ত্বজ্ঞান (মা'রেফাতে-ইলাহীয়া), যা নাজাতের (মুক্তির) ভিত্তিস্বরূপ- লয়প্রাপ্ত না হোক।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ২৭-২৮)

"সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সা.) কত শান ও মর্যাদার নবী! আল্লাহ! আল্লাহ! কী আজিমুশ্বান নূর তিনি! যাঁর নগন্য খাদেম, যাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ উম্মত, যাঁর নগন্য চাকর উল্লিখিত মর্তবা ও আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ (ঐশীবাণী-ওহী ও ইলহাম এবং গায়েবের সংবাদ-ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ইত্যাদি- সংকলক) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা নাবীয়েকা ওয়া হাবীবেকা সৈয়্যদিল আম্বীয়ায়ে ওয়া আফযালির রুসুলে ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।" (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ২৫৬-২৬৫, পাদটিকা নম্বর ১১)

কুরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.)-এর নূরে নূরান্বিত হয়ে মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়্যতের নূরপ্রাপ্ত কেউ নবী হতে পারে। আবার এ কথাও কুরআন শরীফে আছে যে, এ যুগে ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করতে একজন নবী আসবেন (সূরা সাফ, ১০)। আজকে এখানে এ বিষয়ে লেখার সুযোগ হচ্ছে না।

পবিত্র হাদীস 'লা নাবীয়া বা'দী'-এর একটি বিষয় আছে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু উল্লেখ করা হল, 'বা'দী' শব্দের একটি অর্থ আমাকে বাদ দিয়ে কোন নবী আসবে না, যিনি আসবেন তিনি আমার অধীনে আসবেন।

দ্বিতীয় অর্থ হল আমার অল্পকালের মধ্যে কোন নবী আসবে না। আমার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবেন না এ কথা সত্য নয়। অনেক হাদীসে হুযুর (সা.) বলেছেন, হযরত ইমাম মাহদী নবী হয়ে আসবেন। একটি হাদীসে বলেছেন-

اَلَا اِنَّهٗ لَيْسَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَهٗ نَبِىٌّ وَّلَا رَسُوْلٌ

তাঁর (ঈসা (আ.) ও আমার মাঝে কোন নবী নাই। আমার পরে নবী নাই যতদিন হযরত ঈসা (আ.) না আসবেন। অর্থাৎ যখন ঈসা (আ.) আসবেন তখন তিনি নবী হবেন।

হযরত মহানবী (সা.) বলেছেন-

وَلَا الْمَهْدِىُّ اِلَّا عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থ- হযরত ইমাম মাহদী ও ঈসা (আ.) একই ব্যক্তি হবেন। (ইবনে মাজাহ, বাব শিদ্দাতুয যামান)

অনেক বড় বড় বুযূর্গ আলেমগণ লিখেছেন যে, কোন নতুন শরীয়ত বহনকারী নবী আসতে পারে না। কিন্তু আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে হুযুর (সা.)-এর অনুগত নবী আসতে পারেন। এ বিষয়ে আরো তথ্য আছে কিন্তু এখানে এর বেশী লেখার সুযোগ নেই। ওয়া আখেরুদ দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

আল্লাহ্ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের উপমা হলো একটি তাক সদৃশ- যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, সেই প্রদীপটি আছে একটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর ভিতরে, সেই কাঁচের চিমনীটি এমনই দীপ্তিমান যেন সেটি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে (প্রদীপটি) এমন এক কল্যাণ-পূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের (তেল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত যা না পূর্বের না পশ্চিমের (বরং তা সারা বিশ্বের)। তার তেল এমন যে, আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি স্বতঃ প্রবৃত্তভাবে জ্বলে উঠবে। নূরের উপর নূর! (সূরা নূর : ৩৬)

আউয়ালীন ও আখারীনদের জন্য ২৭ মে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক

আলহাজ্জ্ব মাওলানা সালেহ্ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ইসলাম এক জীবন্ত ধর্ম। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় একত্রিত হওয়ার মাঝেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত। জীবন্ত ধর্ম বলেই ইসলামের সুমিষ্ট ফল যুগে-যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করে আসছে। বৃক্ষের পরিচয় মেলে ফলে- এ কথাটি শুধুমাত্র ইসলামের বেলাতেই আমরা সত্য প্রমাণিত হতে দেখি। ইসলামের নবী হযরত খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণ কিয়ামতকাল পর্যন্ত বহমান এবং মানবজাতি তা থেকে উপকৃত হতে থাকবে। ২৭ শে মে, ২০০৮ সনে আহমদীয়া খিলাফতের ১০০ বছর পূর্ণ হয়। এ দিনটি আমাদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ১০০ বছরের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৯ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি (আ.) বলেন- "হে পৃথিবীর সকল অধিবাসী! হে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানবাত্মা! আমি বজ্র-নিনাদে তোমাদের সামনে ঘোষণা দিচ্ছি- পৃথিবীর বুকে এখন একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এবং সত্য খোদা হলেন সেই খোদা- যাঁর বর্ণনা দিয়েছে কুরআন। চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.), যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালোবাসায় আমরা রূহুল কুদ্দুসকে পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নির্দশন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি"।
(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা:১১)

হযরত নবী করীম (সা.)-এর চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হবার অকাট্য প্রমাণ সূরা নূর-এর ৩৬ নম্বর আয়াতে দেয়া হয়েছে । এ আয়াতের অনুবাদ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এভাবে করেছেন-
"আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর নূর। এ নূরের উপমা হলো দেয়ালের একটি কোটরের ন্যায়। যার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে। (এবং সেই) প্রদীপটি গোলাকার কাঁচের চিমনির ভেতরে আছে (এবং) সেই গোলাকার কাঁচটি এত উজ্জল যেন তা একটি উজ্জল নক্ষত্র। সেই (প্রদীপ) এমন পবিত্র বৃক্ষের (তেল) দিয়ে জ্বালানো হয়, (সেই) বৃক্ষটি না পূর্বের, না পশ্চিমের। এর তেল, যদি একে আগুন স্পর্শ না-ও করে তবুও তা জ্বলে ওঠবে। (এ প্রদীপ হলো) অনেক নূরের সমষ্টি। আল্লাহ নিজ নূরের প্রতি যাকে চান হেদায়েত দেন। আর আল্লাহ মানুষকে (একত্ববাদ, নবুয়ত এবং খিলাফত সম্পর্কিত) সব বিষয়াদি বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেকটি বিষয় ভালো করেই জানেন।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর গবেষণা ও তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ অনুযায়ী এ আয়াতে একত্ববাদ, নবুয়ত এবং খিলাফত পরস্পরের সাথে চিরন্তনভাবে জড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন-
"নবীর আবির্ভাবের পূর্বে এ পৃথিবীতে আল্লাহর সত্তা "নার" (আগুন) রূপে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, যে কোন তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু তিনি যখন নবীর মাধ্যমে প্রকাশ হন তখন তিনি নূর হয়ে যান। অর্থাৎ, প্রদীপ রূপে-যার আলো উজ্জ্বল হয়ে থাকে। নবুয়তের মাধ্যমে এ নূর পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু এর সময়সীমা নির্ধারিত থাকে। কারণ মৃত্যুর হাত থেকে নবী রক্ষা পান না, সুতরাং এ 'আলো'-কে দূর-দূরান্তে পৌঁছানোর জন্য এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী করার জন্য অন্য কোন পথ অবলম্বন করা আবশ্যক ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'লা এর জন্য একটি Reflector অর্থাৎ, প্রতিফলক বানিয়েছেন, যার নাম হলো খিলাফত। যেভাবে দেয়ালের কোটরের তিনদিক থেকে আলোকে বাধা দিলে আলো শুধু সেই দিকে ছড়ায় যেদিকে এর প্রয়োজন রয়েছে। এভাবেই খলীফা নবীর পবিত্রকরণ শক্তিকে যা তার জামাতে বিকাশমান থাকে তা নষ্ট হতে দেন না বরং একে রক্ষা করে এক বিশেষ প্রোগ্রামের অধীনে ব্যবহার করেন। এর ফলে জামাতের শক্তির অপচয় হয় না বরং টুকরো-টুকরো শক্তি দিয়ে অনেক কাজ হয়ে যায়, কারণ শক্তির কোন অংশই নষ্ট হয় না। খিলাফত না থাকলে যেসব কাজে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় সেই সব কাজ অবহেলিত রয়ে যায়। আর (খিলাফত না হবার দরুন একতা না থাকায়) বিভক্তির কারণে জামাতের ধন-সম্পদ, জ্ঞান ও সময় কোন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয়ও হতে পারে না। ঐশী নূরকে নবুয়তের মাধ্যমে স্থায়িত্ব ও দীর্ঘায়ু দান করা হয়। সুতরাং দেখ! হযরত রসূল করীম (সা.)- এর মৃত্যুর সাথেই ঐশী নূর শেষ হয়ে যায় নি। বরং খিলাফতের কোটর দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর এই নূরকে হযরত উমর (রা.)-এর

কোটরে (অর্থাৎ, তাঁর সত্তায়) রাখা হলো এবং তিনি এই ঐশী নূরকে আরো সাড়ে দশ বছর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর এই নূরকে হযরত উসমান (রা.)-এর কোটরে রাখা হলো এবং তিনি এই ঐশী নূরকে আরো বার বছর পর্যন্ত ছড়াতে থাকলেন। হযরত উসমান (রা.) এর মৃত্যুর পর এই নূরকে হযরত আলী (রা.)-এর কোটরে রাখা হলো এবং তিনি এই ঐশী নূরকে আরো চার বছর নয় মাস বিচ্ছুরিত করলেন। পরবর্তীতে নামমাত্র খিলাফতের মাধ্যমেও এই নূর চারশত বছর পর্যন্ত স্পেনে ও বাগদাদে আলো দিতে থাকে। যেভাবে টর্চের ভিতরে Reflector (প্রতিফলক) থাকে এবং সেটি বাল্বের আলোকে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। ...এভাবেই খিলাফত হলো সেই Reflector যা নবুয়ত ও একত্ববাদের নূরকে দীর্ঘায়িত করে এবং দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে থাকে।" (তফসিরে কবীর: সূরা নূর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক 'আল ওসীয়্যত'-এর ১৪ পৃষ্ঠায় লিখেন "খোদা তা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন : (১) নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন, (২) অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন-কোন দূর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এ মুজিযা দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল, যখন আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল। বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন।

তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে পুনরায় তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রর্দশন করেন। এমনিভাবে তিনি ইসলামকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর দেয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যা তিনি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

'এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন'। (সূরা নুর: ৫৬)

এসব উদ্ধৃতির আলোকে এটি প্রমাণিত- খোদা তা'লা প্রথমত তাঁর নবী ও পরবর্তীতে নবীর খলীফাদের দ্বারা নিজ অভিপ্রায় পূর্ণ করেন। খোদা তা'লার অভিপ্রায় ইসলামের পুণঃজাগরণ ও সারা পৃথিবীকে তওহীদের পতাকাতলে একত্রিত করার কাজ ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর (আ.)-এর জামাতের মাধ্যমে হবে। আজ খিলাফতে আহমদীয়া পৃথিবীর মানুষের জন্য রক্ষাকবচ এবং খোদার অভিপ্রায় পূর্ণ করার কাজে নিয়োজিত। আজ উম্মতে মুহাম্মদীয়া খোদা প্রদত্ত এ নিয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ক্রোধের লক্ষস্থলে পরিণত হচ্ছে। আউয়ালীন ও আখারীনদের মাঝে মিলনসেতু হলেন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর খিলাফত। আউয়ালীন ও আখারীনদের মাঝে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য হচ্ছে 'খিলাফাতুন আলা মিন হাযিন নবুয়াত'। এক নজরে এ বিষয়ের সাদৃশ্য তুলে ধরছি :

উনবিংশ শতাব্দীর জগৎ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ (Astronomer) মাহমুদ পাশা আল-ফালকি (জন্ম : ১৮১৫, মৃত্যু : ১৮৮৫) **"মাওলুদুন্নাবী ও উমারুহু আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম"**-অর্থাৎ, ফারসী ভাষায় 'নবী করীম (সা.)-এর জন্ম তারিখ ও তাঁর (সা.)-এর বয়স' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সা.)-এর ইন্তেকালের তারিখ ২৬শে মে। এ গ্রন্থটি 'আহমদ যাকি' আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। (আল এ'লাম, ৭ম খন্ড, বৈরুত ১৬৪ পৃষ্ঠা, মে ১৯৮৬)। বিখ্যাত এ গ্রন্থে ইতিহাস, সীরাত ও হাদীসের প্রসিদ্ধ সংকলন হতে তিনি প্রমাণ করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) ১লা রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী সনে- অর্থাৎ ২৬ মে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। মাহমুদ পাশা হাজ্জাতুল বিদার নয় তারিখকে তার গবেষণার ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার ২৮১ আয়াত হাজ্জাতুল বিদার ঐতিহাসিক দিনে নাযিল হয়, এরপর হযরত নবী করীম (সা.) ৮১দিন জীবিত ছিলেন। এভাবে এই ৮১ দিনের পর যে তারিখ দাঁড়ায় তা হলো ১লা রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরী সন এবং গ্রেগোরীয় বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী তা হলো ২৬শে মে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ।

(হযরত সৈয়দ যায়নুল আবেদীন ওলিউল্লাহ শাহ, প্রাক্তন প্রফেসর সিলাহ আইউবিয়া কলেজ বায়তুল মুকাদ্দাস এবং ভাইস প্রিন্সিপাল সুলতানিয়া কলেজ সিরিয়া রচিত তরজমা ও শারাহ সাহীহুল বুখারী, ২য় খন্ড ৭৬৮ পৃষ্ঠা)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই রেওয়ায়াত তফসীর ইবনে জারীর, তফসীর ইবনে কাসীর এবং তফসীরে বাগবীতে সূরা মায়েদার ৪ নম্বর আয়াতের অধীনে লিপিবদ্ধ আছে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সীরাত রচয়িতা আল্লামা শিবলী নোমানী তার সীরাতুন্নবী (সা.) গ্রন্থে ২য় খন্ডে উক্ত গবেষণার ফলাফলকে জোরালোভাবে সমর্থন করে লিখেছেন-

"ওফাতের তারিখ : রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের তারিখ নিয়ে বর্ণনাকারী ও হাদীসের বর্ণনাগুলোতে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হাদীসের কিতাবগুলোতে আন্তরিকতাপূর্ণ অনুসন্ধানের

পরও ওফাতের নির্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা আমার নজরে পড়ে নি। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে তিন প্রকার বর্ণনা করেছেন : (১) রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ, (২) রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় তারিখ, (৩) রবিউল আউয়ালের বারো তারিখ।

এখন এই তিন শ্রেণীর বর্ণনার তুলনামূলক গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করতে হলে বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণ করা একান্ত দরকার। এর জন্য সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও তথ্য পর্যালোচনা অপরিহার্য।

দোসরা রবিউল আউয়ালের বর্ণনাটি হিশাম বিন মোহাম্মদ বিন সায়েব এবং আবু মুখান্নাফের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে (তাবারী, ৫-৬ পৃ.)। এ বর্ণনাকে যদিও অধিকাংশ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ (যেমনঃ ইয়াকুবী, মাসউদী) গ্রহণ করেছেন, তবুও মুহাদ্দিসীনগণ এই দুই বিখ্যাত মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। এ বর্ণনাটি ওয়াকদী হতে ইবনে সায়াদ এবং তাবারীও নকল করেছেন।(জুযয়ে ওয়াফাত)।

কিন্তু ওয়াকদীর বিখ্যাত বর্ণনা, যা তিনি বহু ব্যক্তির নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলেন, তা হলো বারই রবিউল আউয়াল সংক্রান্ত। বায়হাকী স্বীয় দালায়েলে মুসনাদে সহীহ সুলায়মান তায়মী থেকে দোসরা রবিউল আউয়ালের বর্ণনাটি বিবৃত করেছেন। (নুরুন নাবারাস ইবনে সাইয়িদুন নাস : ওফাত অধ্যায়)

কিন্তু রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ সম্বলিত বর্ণনাটি সবচেয়ে বেশী সমর্থনযোগ্য। এ বর্ণনাটি ঐতিহাসিকগণ মূসা বিন ওকবা এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম লাইস মিসরী হতে বর্ণনা করেছেন। (ফতহুল বারী : ওফাত অধ্যায়)। ইমাম সুহাইলী রওজুল উনফ গ্রন্থে এই বর্ণনাকে সত্যের অধিক নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। (দ্বিতীয় খন্ড : ওফাত অধ্যায়)

সর্বপ্রথম উপরোক্ত ইমাম সাহেব অন্বেষায় এক নয়া দিগন্তের সন্ধান লাভ করেন। তিনি বলেন, ১২ই রবিউল আউয়ালের বর্ণনাটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দু'টি ব্যাপার অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, (ক) ওফাতের দিনটি ছিল সোমবার । (সহীহ বুখারী : ওফাত প্রসঙ্গ, সহীহ মুসলিম : কিতাবুস সালাত)। এর অন্তত তিন মাস পূর্বে দশম হিজরীর নয় তারিখ ছিল শুক্রবার। (সহীহ বুখারী : বিদায় হজ্জ ঘটনা)। সুতরাং হিজরী দশম সালের ৯ই যিলহাজ্জ শুক্রবার হতে ১২ই রবিউল আউয়াল হিজরী একাদশ সাল পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায়, যিলহাজ্জ, মহর্‌রম এবং সফর এই তিনটি মাসকে চাই ২৯, ২৯দিনে, চাই ৩০, ৩০ দিনে ধরে নিলে কোন অবস্থাতেই ১২ রবিউল আউয়ালের সোমবার দিন পাওয়া যায় না। তাই বিশ্লেষণের নিরিখে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখটি নিতান্তই ভুল। দোসরা রবিউল আউয়াল হিসাব মতে সোমবার তখনই পড়বে, যখন উপরোক্ত তিনটি মাস ২৯ দিনে ধরা হবে। সুতরাং যখন প্রথম দুই দিক থেকে বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়, তখন তৃতীয়, পথটি-ই থাকে যা অধিকাংশ সময় ঘটে থাকে। অর্থাৎ দুই মাস ২৯ দিনে এবং একমাস ৩০ দিনে।

এ হিসাব মতে ২৯শে রবিউল আউয়াল হবে সোমবার এবং এটাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের বর্ণনা। নিম্নের ছক হতে জানা যাবে যে, ৯ই যিলহাজ্জ শুক্রবার হলে রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে সোমবার দিন কবে আসে।

ন. প্রস্তাবিত সারণী	সোমবার	সোমবার	সোমবার
১. যিলহাজ্জ, মহর্‌রম এবং সফর সব ৩০দিনে	৬	১৩	-
২. যিলহজ্জ, মহর্‌রম এবং সফর সব ২৯দিনে	২	৯	১৬
৩. যিলহাজ্জ ২৯, মহর্‌রম ২৯ এবং সফর ৩০দিনে	১	৮	১৫
৪. যিলহাজ্জ ৩০, মহর্‌রম ২৯ এবং সফর ২৯ দিনে	১	৮	১৫
৫. যিলহাজ্জ ২৯, মহর্‌রম ৩০ এবং সফর ২৯ দিনে	১	৮	১৫
৬. যিলহাজ্জ ৩০, মহর্‌রম ২৯ এবং সফর ৩০দিনে	৭	১৪	-
৭. যিলহাজ্জ ৩০, মহর্‌রম ৩০ এবং সফর ২৯ দিনে	৭	১৪	-
৮. যিলহাজ্জ ২৯, মহর্‌রম এবং সফর ৩০দিনে	৭	১৪	-

উপরের পরিকল্পিত সারণীর দ্বারা বুঝা যায় যে, ৬,৭, ৮, ১৩, ১৯, ১৪, ১৫ তারিখ খুবই প্রণিধানযোগ্য। এছাড়া তারিখগুলোর স্বপক্ষে কোন রেওয়ায়েতও পাওয়া যায় না। এখন বাকী থাকে ১ম ও ২য় তারিখদ্বয়। দ্বিতীয় তারিখটি কেবল এক অবস্থাতেই পাওয়া যায়। যা প্রস্তাবিত নিয়ম অনুসারে গ্রহণ করা যায় না। ১ম তারিখ তিনটি পর্যায়ে পাওয়া যায় এবং এ তিনটি পর্যায়ই অধিক সমুপস্থিত। বহু সহীহ হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ কারণে ওফাতে নববীর বিশুদ্ধ তারিখ আমাদের মতানুসারে প্রথম রবিউল আউয়াল, হিজরী ১১ সাল। এ হিসাবের মাঝে শুধু কেবল হযরত বেলাল (রা.)-এর বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যার বর্ণনার উপর ইসলামী চাঁন্দ্র মাসের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। সৌর বর্ষের নিয়মতান্ত্রিকতায় সম্ভবতঃ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নয়।

তফসীরের গ্রন্থাবলীতে

"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম" আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে- "এ আয়াতের নাযিলের দিন (৯ যিলহাজ্জ, হিজরী ১০ম সাল) হতে ওফাত দিন পর্যন্ত ৮১ দিন। (দেখুন ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, বাগবী)। সুতরাং আমাদের হিসেব অনুসারে ৯ই যিলহাজ্জ দশম হিজরী সাল হতে ১লা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত দুই মাস ২৯ দিনে এবং এক মাস ৩০ দিন ধরে (যা আমাদের প্রস্তাবিত সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে) সর্বমোট ৮১ দিনই হয়। আবু নাঈমও স্বীয় প্রমাণাদিতে সনদসহ ১লা রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ওফাতের তারিখ নির্ধারণ করেছেন।"
(সীরাতুন্‌নবী, ২য় খন্ড, ৪৬৭-৪৬৮ পৃষ্ঠা)।

এছাড়াও পশ্চিমা গবেষকরাও মাহমুদ ফালকি পাশার এ

গবেষণাকে মেনে নিচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ : Alan Black Wood তাঁর পুস্তক A to Z Famous people-এ সর্বপ্রথম নাম হযরত রসূল করীম (সা.)-এর রেখেছেন এবং সেখানে তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর তারিখ ২৬শে মে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ লিখেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের বয়াতকাল

সীরাতের পুস্তাকাদি পাঠে এ বিষয়টি জানা যায়, হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হওয়ার বিষয়ের সিদ্ধান্ত বনু সাঈদার বৈঠক খানায় ২৬শে মে তারিখেই হয়েছিল। সুতরাং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত ইবনে হিশাম মু'আফিরী রচিত সীরাতুন্নবী-এর ৩৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-

"ইবনে ইসহাক বলেন : আমার নিকট যুহরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট আনাস ইবনে মালিক বলেন : বনু সাঈদার বৈঠকখানায় আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন সমাপ্ত হলে পরবর্তী দিন তিনি মিম্বরে আসীন হলেন। এ সময় উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) উঠে আবু বকর (রা.)-এর পূর্বে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা ও স্তুতি নিবেদন করলেন, এরপর বললেন: 'হে লোক সকল! আমি গতকাল আপনাদের সামনে একটি কথা রেখেছিলাম, যা আমি আল্লাহ্‌র কিতাবেও পাই নি এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-ও তা আমাকে বলে যান নি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় আমাদের ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে যাবেন। তিনি হবেন আমাদের মধ্যে সব শেষে মৃত্যু বরণকারী। আল্লাহ তা'লা আপনাদের মাঝে তাঁর কিতাব রেখে দিয়েছেন। যা দিয়ে তিনি তাঁর রসূল (সা.)-কে পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আপনারা যদি এ কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন, তাহলে আল্লাহ তা'লা তাঁকে যেমন পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি পথ-নির্দেশ আপনাদেরও দেবেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির হাতে আপনাদের বিষয়টি সুসংহত করে দিয়েছেন। তিনি হলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বন্ধু আর তাঁরা যখন গুহায় ছিলেন, তখন দুইজনের অন্যতম। অতএব, আপনারা উঠুন এবং তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করুন। তখন সব মানুষ সাধারণভাবে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণ করলো এবং এটা হলো বনু সাঈদার বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত বয়াতের পর।' উপরে বর্ণিত দু'টি ঘটনা অর্থাৎ হযরত নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যু ২৬শে মে তারিখে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর খলীফা হিসেবে ২৭শে মে তারিখে সাধারণ বয়াত গ্রহণ আখারীনদের জন্য এক বড় নির্দশন।

প্রথমত: হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক আল-ওসীয়্যতে যে দুই কুদরত প্রকাশের কথা বলেছেন, যার অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরের ৫৬ নম্বর আয়াতে করেছেন, তা আমরা আউয়ালীনদের মাঝে হযরত রসূল করীম (সা.) ও তাঁর মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীনদের মাধ্যমে পূর্ণ হতে দেখেছি।

একইভাবে হযরত নবী করীম (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক ও দাস হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও তাঁর খোলাফাদের মাধ্যমে সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতের পূর্ণতা, হযরত নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পুস্তক আল-ওসীয়্যতে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ করেছে।

এটি এক আশ্চর্য ব্যাপার। হযরত রসূলে করীম (সা.) মৃত্যুবরণ করেন ২৬শে মে তারিখে এবং তাঁর দাস ইমাম মাহদী (আ.)-ও মৃত্যুবরণ করেন ২৬শে মে তারিখে। যেভাবে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর দিন ২৭শে মে মসজিদে নববীতে সাধারণ বয়াত অনুষ্ঠিত হয়ে আউয়ালীনদের মাঝে খিলাফতের ধারা শুরু হয়, ঠিক তেমনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মৃত্যুর পরদিন ২৭শে মে আখারীনদের মাঝেও 'খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুয়ত' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কি কোন মানবীয় কাজ ? কখনো নয়, এ হলো খোদার কাজ! সুতরাং সত্য অনুসন্ধানীদের জন্য এর মাঝে এক বড় নিদর্শন রয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, জাতি ও গোষ্ঠিতে যুগে যুগে যত নবী, রসূল ও মহাপুরুষ আগমন করেছেন তাদের কেউ-ই নিজেদেরকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হওয়ার দাবী করেন নি। একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-ই এ দাবী করেছেন যে, আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি এবং আমার উপর অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ ঐশী গ্রন্থ। কুরআন শরীফে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং ঘোষণা করছেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(সুরা আম্বিয়া : ১০৮) অর্থাৎ, 'আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি'। তাছাড়া মুহাম্মদ (সা.) যে, সকল নবীগণের নেতা, সর্দার বা সকল নবীগণের মোহর সে সম্পর্কেও কুরআনের সাক্ষ্য হচ্ছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(আহযাব: ৪১) অর্থাৎ, 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মাঝে কারো পিতা নয়। কিন্তু (সে) আল্লাহ্‌র রসূল ও নবীদের মোহর।'

অর্থাৎ সারকথা হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বের সকল নবীই ছিলেন নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত। তাই এমন এক নবীর আগমনের প্রয়োজন ছিল যিনি সমগ্র জাতিকে উম্মতে ওয়াহেদা অর্থাৎ এক জাতিতে পরিণত করবেন। তাই এই আগমনকারী নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্বের নবীগণ করে গেছেন যেন সকল জাতিই তাকে খুব সহজেই চিনতে পারে আর তারা যেন এই অজুহাত দেখাতে না পারে যে, আমাদের ধর্মে তো সেই নবী সম্বন্ধে কোন সংবাদ নেই, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবো কিভাবে? তাই মহান আল্লাহ তা'লা সেই ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনের পূর্বে আগত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও সেই মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রেখেছেন। যদিও সেগুলো মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে তথাপি পবিত্রাত্মা ও পূণ্যবানদের জন্য এখনো সেগুলোতে সত্যের জ্যোতি বিদ্যমান যা দেখে তারা সেই আগমনকারী মহাপুরুষের প্রতি ঈমান এনে হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

বাইবেলের পূরাতন নিয়মে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী এক: বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে মূসা সদৃশ এক নবীর আগমন হবে-
বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আছে "তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তাঁর কথামত তোমাদের চলতে হবে।" (দ্বিতীয় বিবরন- ১৮:১৫)

আবার এর সাথে বাইবেলে এ কথাও আছে, "আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাবো। তার মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে আদেশ দেব সে তাই তাদের বলবে।" (দ্বিতীয় বিবরন ১৮:১৮)

মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী যখন উপস্থাপন করা হয় তখন খৃষ্টান ভাইয়েরা এই আপত্তি করেন যে, মুহাম্মদ (সা.) নয় বরং যীশুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীই এখানে করা হয়েছে। তাদের এই দাবীর মোটেও কোন ভিত্তি নেই। কারণ বাইবেলের উপরোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের মাঝেই তাদের এই দাবীর খন্ডন বিদ্যমান। যেমন: (১) এখানে মোশি অর্থাৎ মূসা (আ.) স্পষ্টভাবে বলছেন 'আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন' অথচ যীশু কখনো নিজেকে মূসার সদৃশ বলে ইঞ্জিলের কোথাও দাবী করেননি। (২) যীশু মূসার ন্যায় কোন নতুন ব্যবস্থা বা শরীয়ত নিয়ে আসেন নি বরং তার শরীয়তকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন। (মথি ৫: ১৭-১৮) (৩) এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, এই নবী তাদের অর্থাৎ 'ইস্রায়েলীয়দের ভাইদের মধ্য হতে' আগমন করবেন। এখানে 'তাদের মধ্য থেকে' বলা হয় নি। আর ইস্রায়েলীয়দের ভাই বলতে আব্রাহামের আরেক পুত্র ইসমাঈলের বংশধর অর্থাৎ বনী ইসমাঈলকেই বোঝায়। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বনী ইসমাঈলেই জন্মগ্রহন করেছেন। ইস্রায়েলীদের ভাই বলতে বনী ইসমাঈলকেই যে বোঝানো হয়েছে এর জন্য আরো দেখুন (আদি পুস্তক ১৬: ১১-১২ ও আদি পুস্তক ২৫: ১৭-১৮) । (৪) নবুয়ত লাভের ক্ষেত্রেও মূসা (আ.)-এর সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাদৃশ্য রয়েছে। মূসা (আ.) ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত

লাভ করেছিলেন (প্রেরিত ৭ : ৩০)। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা.) ও ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন পক্ষান্তরে যীশু নবুয়ত লাভ করেছিলেন ৩০ বৎসর বয়সে।

ভবিষ্যদ্বাণী দুই: 'পারন' নামক এলাকা থেকে তিনি অর্থাৎ সেই নবী আগমন করবেন-
বাইবেলে আছে "সদাপ্রভূ সিনাই থেকে আসলেন, তিনি সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন, তার আলো 'পারন' পাহাড় থেকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি লক্ষ লক্ষ পবিত্র স্বর্গদূতদের মাঝখান থেকে আসলেন; তার ডান হাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুন ভরা আইন।" (দ্বিতীয় বিবরন ৩৩ : ২)

মক্কা সহ সমগ্র হেজাজ এলাকাকে 'পারন' বা আরবীতে 'ফারান' বলা হয়। আরব ভূগোল বিশারদদের মতানুযায়ী এ কথা প্রমাণিত। আর বাইবেলে এ কথা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান যে, মহানবী (সা.) এর পূর্ব-পুরুষগণ অর্থাৎ বনী ইসমাঈল এ এলাকাতেই বসবাস করতেন। বাইবেলে বলা হয়েছে-"পারন নামে এক মরু এলাকায় সে (ইসমাঈল) বাস করতে লাগলো।" (আদিপুস্তক ২১:২১) এই ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি অংশে যে আগুন ভরা আইনের কথা বলা হয়েছে তা-ও কুরআন করীম নাযেল হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে।

ভবিষ্যদ্বাণী তিন: সেই নবীর চেহারার বর্ণনা ও দশ হাজার পবিত্র আত্মাসহ আগমন- বাইবেলে হযরত সুলায়মান (আ.) সেই প্রতিশ্রুত নবীর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, "আমার প্রিয়ের চেহারা শ্বেত, লালচে তার গায়ের রং; দশ হাজার জনের মধ্যে তিনি বিশেষ একজন। তাঁর মাথা খাঁটি সোনার মত, তাঁর চুল ঢেউ খেলানো আর দাঁড় কাকের মত কালো।" (পরমগীত ৫:১০-১৬)

এই ভবিষ্যদ্বাণীও মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই নবীর চেহারার যে বর্ণনা এসেছে তা পুরোপুরি মুহাম্মদ (সা.)-এর চেহারার সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন– মহানবী (সা.) এর চেহারা ছিল সাদা ও উজ্জ্বল লালচে আর চুল ছিল কালো ও ঢেউ খেলানো। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর চেহারা ছিল রক্তিম বর্ণের ও চুল ছিল কোকড়ানো ও সোনালী বর্ণের। এই ভবিষ্যদ্বাণীর আরেকটি অংশে বলা হয়েছে, সেই নবী দশ হাজার জনের মধ্যে বিশেষ একজন। মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তাঁর সাথে দশ হাজার সাহাবী ছিলেন। তিনি (সা.) ছিলেন তাদের সবার মাঝে বিশেষ একজন।

বাইবেলের নূতন নিয়মে অর্থাৎ ইঞ্জিলে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী এক: প্রতিশ্রুত সেই নবীর অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদান করা হবে-
ইঞ্জিলে এসেছে নবী মুসা বলেছিলেন, "তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মত একজন নবী দাঁড় করাবেন। তার কথামত তোমাদের চলতে হবে। যে তার কথা শুনবেনা তাকে তার লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করা হবে।" (প্রেরিত ৩:২২-২৩)

বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীও আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে। কারণ তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁর বড় বড় বিরোধীরা ধ্বংস হয়েছিল যেমন আবু জাহেল, আবু লাহাব, আরো অনেকেই। এই ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মসীহ্‌র দ্বারা পূর্ণ হয় না কেননা তার জীবদ্দশাতে তাঁর কোন বিরুদ্ধবাদী মারা যায় নি উপরন্তু তাঁকেই ক্রুশে চড়তে হয়েছিল।

ভবিষ্যদ্বাণী দুই: মসীহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর পর এমন এক সত্যের রুহ্ (আত্মা) আগমন করবেন তিনি যা কিছু বলবেন ঈশ্বরের পক্ষ থেকেই বলবেন এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে-

ইঞ্জিলে মসীহ্ সেই প্রতিশ্রুত নবীর আগমন সম্পর্কে বলছেন "কিন্তু সেই সত্যের রুহ্ যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শোনেন তাই বলবেন। আর যা কিছু ঘটবে তাও তিনি তোমাদের জানাবেন।" (যোহন ১৬:১৩)

এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। মসীহ্‌র পর মুহাম্মদ (সা.)-ই এসেছেন যিনি পূর্ণ সত্য দেখিয়েছেন । মুহাম্মদ (সা.) যা কিছু বলতেন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকেই বলতেন (সূরা নজম : ৪-৫)। পৃথিবী সাক্ষী যে, মুহাম্মদ (সা.) আজ থেকে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং আজও পূর্ণ হচ্ছে।

ভবিষ্যদ্বাণী তিন: সেই নবী এসে মসীহ্‌র মহিমা প্রকাশ করবেন- মসীহ্ সেই নবী সম্পর্কে বলছেন, "সেই সত্যের রুহ্ আমারই মহিমা প্রকাশ করবেন, কারণ আমি যা করি ও বলি তাই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন" (যোহন ১৬:১৪)।

মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে মসীহ্‌র এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) এসে মসীহ্‌র মহিমা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁকে ক্রুশীয় মৃত্যুর অপবাদ থেকে এবং তাঁর মাকে অসতী অপবাদ থেকে মুক্ত করেছেন।

ভবিষ্যদ্বাণী চার: মসীহ্‌র পর অন্য একজন সাহায্যকারী আসবেন। যার শিক্ষা চিরকাল থাকবে।

মসীহ্ বলেন "আমি পিতার কাছে চাইব, আর তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবার জন্য আরেকজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দিবেন।" (যোহন ১৪:১৬)

এই ভবিষ্যদ্বানীটিও একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করেছে কেননা মসীহ্‌র পর চিরস্থায়ী শরীয়ত নিয়ে একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-ই আগমন করেছেন।

হিন্দু ধর্ম গ্রন্থসমূহে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র কুরআনের ঘোষনা-

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থ: পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা সতর্ককারী অর্থাৎ নবী রসূল পাঠান নি। (সুরা ফাতির: ২৫)

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন তীর্থস্থান ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। সিন্ধু নদের অববাহিকায় যে জাতির বাস ছিল তারাই আজ হিন্দু নামে অভিহিত। এই হিন্দু জাতিতেও অনেক মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে। যাদেরকে বর্তমানে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে পূজা করে থাকে। অথচ তারা সবাই ছিল তাদের নিজ নিজ সময়ের খোদার পক্ষ থেকে আসা সতর্ককারী। তেমনি তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোও ছিল খোদার পক্ষ থেকে আসা ঐশীগ্রন্থ। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এতে অনেক সংযোজন ও বিয়োজন হয়েছে। মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপের হাত থেকে এই পবিত্র গ্রন্থগুলো রেহাই পায় নি। তাই আজ সেগুলো তাদের প্রকৃত রুপ থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। তথাপি খোদা তা'লার অপার মহিমা যে এখনো সেগুলোতে কিছু সত্যের ঝলক বিদ্যমান এবং কিছু সত্য ভবিষ্যদ্বাণীও বিদ্যমান যেগুলো সত্য প্রমাণিত হয়ে নিজেদের সত্যতার প্রমান বহন করে চলেছে। যদিও এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ছিল একটি জাতি বা গোষ্ঠির জন্য সীমাবদ্ধ কিন্তু এতে ভবিষ্যতে আগমনকারী সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য আগমন করবেন। আর একমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমেই সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে।

হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ বেদে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী এক: মানব কর্তৃক প্রশংসিত এক নবীর আগমন হবে-

অথর্ব বেদে আগমনকারী সেই নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংসঃস্তবিষ্যতে।" (অথর্ব বেদ ২০ নম্বর গ্রন্থ, ১২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ, ১ নম্বর মন্ত্র) অর্থ: 'এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি হবেন মানব কর্তৃক প্রশংসিত।'

আমরা যদি 'নরাশংস' শব্দটিকে মুহাম্মদ শব্দটির সাথে মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাই দুটি শব্দের অর্থ পুরোপুরি এক। 'নরাশংস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নর দ্বারা অর্থাৎ মানুষ দ্বারা প্রশংসিত। তদ্রুপ মুহাম্মদ শব্দের অর্থও প্রশংসিত অর্থাৎ মানব কর্তৃক যিনি অনেক বেশী প্রশংসিত।

ভবিষ্যদ্বাণী দুই: সেই প্রতিশ্রুত নবী উটে আরোহণ করবেন-

অথর্ব বেদের আরেক স্থানে আছে "উষ্ট্রা যস্য প্রবাহনো বধুমন্তো দ্বির্দশ" (অথর্ব বেদ ২০ নম্বর গ্রন্থ, ১২৭ নম্বর অনুচ্ছেদ, ২ নম্বর মন্ত্র) অর্থাৎ 'ঐ প্রশংসিত মহাপুরুষ উটের উপর আরোহণ করে আবির্ভূত হবেন। তার দ্বাদশ সহধর্মিণী হবেন।'

গীতায় মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যদ্বাণী এক: যখনই ধর্মের পতন ও অধর্ম দেখা দিবে তখনই একজন মহাপুরুষের আগমন ঘটবে-

গীতায় রয়েছে "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ // পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে //" (গীতা,অধ্যায়: ৪, শ্লোক: ৭-৮) অনুবাদ: 'যখনই ধর্মে অধঃপতন হবে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হব। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হব।'

ভবিষ্যদ্বাণী দুই: সমস্ত জাতির জন্য এক বিশ্বনবীর আগমন ঘটবে-

গীতায় রয়েছে কৃষ্ণ তাঁর শিষ্য অর্জুনকে ভবিষ্যতে আগত তাঁর কয়েকটি বিশ্বরুপ দেখালেন। যেখানে অর্জুন সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষকে দেখে বলে উঠলেন-

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ" (গীতা, অধ্যায়: ১১, শ্লোক: ১২) অর্থাৎ 'যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই মহাত্ম বিশ্বরুপের প্রভার কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে।'

শ্রী কৃষ্ণ ছিলেন জাতীয় অবতার। কিন্তু অর্জুন তাঁর সামনে বিদ্যমান এই কৃষ্ণের চেয়ে হাজারো গুণ দীপ্তিমান এক সত্তাকে দেখলেন। যিনি হাজারো সূর্য তুল্য। যিনি শুধু এক জাতি, এক দেশের জন্য আসবেন না। আসবেন এক বিশ্বরুপ নিয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য। গীতার উপরোক্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.)-ই হচ্ছেন সেই মহাপুরুষ যাকে পবিত্র কুরআনে 'সিরাজুম্ মুনীর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী তিন: আহমদ নামে এক সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আগমন হবে-

গীতায় রয়েছে- "অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ" (গীতা, অধ্যায়: ১০, শ্লোক: ২) অর্থাৎ 'আহমদ দেবতা দেবতাদের মাঝে সর্বোতভাবে মহির্ষী।'

পুরানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

পুরানে খুবই স্পষ্টভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কিত কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

ভবিষ্যদ্বাণী এক: 'মহামদ' নামে এক মহাপুরুষের আগমন হবে-
ভবিষ্যপুরানে রয়েছে- "মহামদ ইতিখ্যাত: শিষ্যশাখা সমন্বিত: নৃ পশ্চব মহা দেবং মরুস্থল নিবাসিনম।" (ভবিষ্যপুরান-৩, খন্ড: ৩, অধ্যায়: ৩ শ্লোক: ৫, ৬) অর্থাৎ 'মহামদ নামে এক মহাপুরুষ মরু অঞ্চলে শিষ্যসহ আবির্ভূত হবেন। তাকে অর্থাৎ সেই মরুস্থলে আগমনকারী মহাদেবকে নমস্কার।'

ভবিষ্যদ্বাণী দুই: খৎনা সম্পন্ন একজন মহাপুরুষ আগমন করবেন-
ভবিষ্যপুরানের আরেক স্থানে এসেছে-"লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীন: শ্মশ্রুধারী স দ্রষক: উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম।" (ভবিষ্যপুরান-৩, খন্ড: ৩, অধ্যায়: ৩, শ্লোক: ২৫) অর্থাৎ 'এই মহাপুরুষের খৎনা হবে, টিকি না রেখে তিনি দাড়ি রাখবেন। তিনি উঁচু আওয়াজে আহবান করবেন। তিনি হালাল খাদ্য গ্রহন করবেন'।

ভবিষ্যপুরানের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রতিটি বাক্য একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের মাধ্যমেই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে।

ভবিষ্যদ্বাণী তিন: শান্তির শহর অর্থাৎ মক্কায় সেই মহাপুরুষের জন্ম হবে-
কল্কি পুরানে আছে "শাম্ভলে বিষ্ণুয শস্যে গৃহে প্রাদুর্ভবামাহম" (কল্কি পুরান, ২য় অধ্যায়, শ্লোক: ৪) অর্থাৎ 'কলির কালে বিষ্ণু দাসের গৃহে, সম্ভল শহরে কল্কি অবতারের জন্ম হবে।'

বিষ্ণু শব্দের আরবী অনুবাদ হচ্ছে 'আল্লাহ্' আর দাসের আরবী হচ্ছে 'আব্দ। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্র ঘরে সেই মহাপুরুষ জন্ম নিবেন। তাছাড়া এখানে 'সম্ভল' যে শব্দ এসেছে তার আরবী হচ্ছে আমান অর্থাৎ শান্তি। আর এক সাথে অর্থ করলে দাঁড়ায় 'দারুল আমান'। পবিত্র মক্কা নগরীর আরেক নাম হচ্ছে 'দারুল আমান' অর্থাৎ শান্তির শহর।

ভবিষ্যদ্বাণী চার: সেই মহাপুরুষের চার খলীফা থাকবে-
কল্কি পুরানে আছে "চতুর্ভি ভ্রাতৃভির্দেব! করিষ্যামি কলিক্ষয়ম" (কল্কি পুরান, ২/১৫) অর্থাৎ 'তার ভ্রাতৃতুল্য চারজন সহকর্মী হবেন, তাদের সহযোগে তিনি কলি (জাহেলিয়াত) ক্ষয় করবেন।

ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচ: নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার যুগে সেই মহাপুরুষ আগমন করবেন-
"কলি যুগে যখন রাজারা হবে ডাকাতের মত তখন বিষ্ণু দাশের ঘরে কল্কি জন্ম নিবে। (কল্কিপুরান, ২/৭)

আমরা সকলেই অবগত যে, মুহাম্মদ (সা.) সেই জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতার যুগেই জন্ম নিয়েছিলেন যখন সর্বত্রই ছিল হানাহানি নৈরাজ্য ও অধিকার হননের চিত্র।

সুধী পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ সমূহে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান তা একমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভূ নবীকূলের শিরোমণি রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা.)-এর শুভাগমনের মাধ্যমেই অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর (সা.) আগমনের মাধ্যমে শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে। মানবজাতি তার উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিৎ এই মহান নবীর প্রতি প্রতিনিয়ত অবারিত দরুদ প্রেরণ করা আর এই দোয়া করা যে, এই পৃথিবীর যে সমস্ত মানুষ এখনো এই মহান নবীর শান ও মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত নয় আল্লাহ তা'লা তাদের সকলকে এই মহা মর্যাদাবান নবীর শান ও মর্যাদা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং এই নবীর প্রতি ঈমান এনে হেদায়াত লাভ করার তৌফিক দান করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এই মহান নবীর পবিত্র জীবনাদর্শ অনুসরণ করার ও তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরুদ প্রেরণ করার তৌফিক দান করুন (আমীন)।

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی
اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ
اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی
اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

সাহিত্য সংস্কৃতি ও মহানবী (সা.)

মাওলানা ইয়াছিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মানুষ সামাজিক জীব। প্রতিটি মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতির আশা-আকাঙ্খার, ভাবনা-কল্পনার, তাহযীব ও তামাদ্দুনের, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মানুষের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য সংস্কৃতিও এক অপরিহার্য বিষয়। সাহিত্য হচ্ছে মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের শুভবুদ্ধির উজ্জীবনী শক্তি। সুস্বপ্নের বাতায়ন, জীবন চলার পথে সতর্ক সার্চ-লাইট। সাহিত্য মানেই কল্প লোকের বিস্তার বা সম্মোহনের স্বপ্নজাল নয়। যে সাহিত্য তার সম্মোহনী জালে আত্মবিলীনতার বীজ বপন করে সে সাহিত্য সৎ ও প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না। মহানবী (সা.) এর নবুয়ত লাভের সময়ে আরবে কবি ও কবিতা বহুল প্রচলিত ও চর্চিত বিষয় ছিল। আরবের মানুষের মন ও মনন, আরবের পথ ও প্রান্তর সাহিত্য, কবি ও কবিতার দ্বারা মেঘমালার মতো আবৃত ছিল। ইসলামের প্রচার শুরু হলে এর বিরোধীতায় কাফেররা যখন কবি ও কবিতাকে সর্বশক্তি দিয়ে নিয়োজিত করল, তখন পবিত্র কুরআনে কবিদের সম্পর্কে নীতি-নির্ধারণী আয়াত নাযিল হল। ইরশাদ হলো,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا.

"আর কবিদের কথা! তাদের অনুসরণকারী হচ্ছে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি লক্ষ্য কর না, তাদের প্রতি যে, তারা প্রত্যেক ময়দানে কেমন উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করে? এবং তারা এমন সব কথাবার্তার অবতারণা করে যা তারা নিজেরাও (পালন) করে না। তবে তারা ছাড়া, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং স্মরণ করেছে আল্লাহকে বারবার, আর প্রতিকার করেছে অত্যাচারিত হওয়ার পর। (সূরা শু'আরা : আয়াত, ২২৫-২২৮) এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর পর হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাস্সান বিন সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী (রা.) কবি কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'লা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের উপায় কী? উত্তরে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অশ্লীলতা ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত কবিদের শামিল। (ফতহুল বারী)

বাংলায় আমরা যাকে সাহিত্য বলি আরবিতে তা **'আল আদব'**। তবে আরবি ভাষায় **'আল আদব'** শব্দটি 'সাহিত্য' থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। সাহিত্য বলতে যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগ অনুভূতির অভিব্যক্তি বোঝায় এবং শিল্পোৎকর্ষ চমৎকার কথামালা বোঝায়, তাহলে **'আল আদব'** দ্বারাও তা বোঝায়। তবে **'আল আদব'** এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু ভাবও রয়েছে। আর তা হল, শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নৈতিকতা ইত্যাদি। জাহেলী যুগের আরবি সাহিত্যে **'আদব'** শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। তেমনিভাবে আল কুরআনেও এই শব্দটি নেই। তবে এ অর্থের ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদিসে এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তাঁর (সা.) অনুপম কথামালা, বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, উন্নত মানের আচার-আচরণ, আদব-অভ্যাস, চাল-চলন ইত্যাদি দেখে সাহাবীরা (রা.) অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইতেন, আপনি এসব কোথা থেকে লাভ করেছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলতেন, أَدَّبَنِىْ رَبِّىْ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

অর্থাৎ আমার রব, আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে এ **আদব** শিখেয়েছেন। সুতরাং তিনি আমাকে সুন্দরভাবেই শিখিয়েছেন। (আহমাদ শায়িব, উসূল আন-নাকদ আল আদাবী, পৃ. ৪) এখানে اَلْأَدَبُ (আল আদব) শব্দটি শিক্ষাদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহানবী (সা.) এর আরেকটি বাণীতে এসেছে,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدَبَةُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوْا مِنْ مَأْدَبَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ পৃথিবীতে এই কুরআন হল আল্লাহর শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল। সুতরাং এ সমাবেশ স্থল হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (ইবনুল আছীর, আন-নিহায়া, আদব)

সাহিত্য চর্চায় মহানবী (সা.) এর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে ইসলাম-পূর্ব আরবের সাহিত্য ও সাহিত্যচর্চার অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। সাহিত্যকে সাধারনভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: গদ্য ও পদ্য। ছন্দ ও অন্তমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয় এমন শিল্পমান সম্পন্ন কথাকে গদ্য বলে। আর যাতে ছন্দ ও অন্তমিল থাকে তাকে পদ্য বলে। জাহিলী যুগের আরবরা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে লেখার ব্যবহার করেছে। আল জাহিক বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে রাখত। আর তারা তাদের লিখিত চুক্তিসমূহকে **'আল মাহরিক'** বলত। তারা তাদের গদ্যে যথেষ্ট ضَرْبُ الاَمْثَالِ (প্রবাদ-প্রবচন) ব্যবহার করত। এ ছাড়া তাদের ছিল খুৎবা (বক্তৃতা-ভাষণ) দানের রীতি। আর পদ্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপি। অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা ও বাগ্মিতায় তারা অতি উঁচু স্তরে উপনীত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'লা কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

অর্থাৎ 'আর এমন কিছু মানুষ আছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তাদের মনের মাঝে যা (লুকায়িত) আছে সে ব্যাপারে তারা আল্লাহকে সাক্ষ্য স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।' (সূরা বাকারা: ২০৫) কথাশিল্প ও বাগ্মিতায় তাদের প্রচন্ড দখলের আরো একটি প্রমাণ হল, আল কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছে। এটাও তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বাগ্মিতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। তেমনিভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও গুরত্বের পার্থক্য নিরুপণ এবং শব্দের ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা কতটুকু তা যে তারা বুঝত, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আল ওয়ালীদ ইবনে আল মুগীরা যে কিনা ইসলামের একজন ঘোর বিরোধী ছিল, একদা রসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট কুরআন শুনতে চাইলে রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আল কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। এতে সে কেঁপে উঠে এবং অবলীলায় বলতে থাকে,

وَاللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلَاماً مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْإِنْسِ
وَ لَا مِن كَلَامِ الْجِنِّ- وَ اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَ اِنَّ عَلَيْهِ
لَطَلَاوَةً وَ اِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَ لَا يَعْلِىْ عَلَيْهِ وَ مَا يَقُوْلُ هٰذَا بَشَرٌ

"খোদার কসম! আমি মুহাম্মদের নিকট কিছু কথা শুনেছি। তা না মানুষের কথা, না জ্বিনের। সে কথার আছে চমৎকার জাদু। তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, নিম্নভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয়।' (আস-যামাখশারী, আল-কাশশাফ)

বনু তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য ও বক্তা আমর ইবনে আল আহতাম্মের ভাষণ শুনে তার বাক পটুতায় মুগ্ধ হয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) মন্তব্য করেন:

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْراً وَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكَماً

অর্থাৎ "নিশ্চয় কিছু কিছু ভাষণ ও কবিতায় জাদু ও প্রজ্ঞা রয়েছে।" (বুখারী)

মহানবী (সা.) এর খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, "রসূলুল্লাহ (সা.) যখন আমাদের এখানে (মদীনা) আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা পাঠ করা হত। "

রসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কবি ছিলেন না, তবে তিনি কবিতা শুনেছেন ও পছন্দ করেছেন, আবৃত্তি করেছেন। কবিদেরকে উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য করেন, "কোনো কোনো বাগ্মীতায় জাদু আছে। আর কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে জ্ঞান বা হিকমতের কথা। একদা শারীদ ছাকাফী রসূলুল্লাহ (সা.) এর বাহনের পেছনে আরোহী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে চাইলেন। তিনি যখন আবৃত্তি করছিলেন তখন রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আরো শোনাতে বলছিলেন। তিনি সেদিন মোট একশ'টি কবিতা শুনেছিলেন (মুসলিম)। রসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় হিজরতের পর থেকেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের কুফ্ফার ও কবিরা সকলে ইসলাম-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা তাদের কবিতার দ্বারা মহানবী (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কুৎসা রচনা করে প্রচার করতে থাকে। এর মাধ্যমে তারা ইসলাম প্রচারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। একদিন অতিষ্ঠ হয়ে তিনি (সা.) মদীনার আনসারদের লক্ষ করে বলেন, 'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করছে, জিহ্বা দ্বারা সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাঁধা দিয়েছে?' (মুসলিম)। এ কথা শুনে হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.) বলেন, আমি এর জন্য প্রস্তুত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমিও তো কুরাইশ বংশের । তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, ' **মথিত আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা হয় আমিও তদ্রুপ আপনাকে বের করে আনবো**।' তার জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা শুনে বলতেন, 'আমার পক্ষ থেকে জবাব দাও। হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুস দ্বারা তুমি তার সাহায্য করো।' অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা শুনে বলেন, **'তার এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্রতর'**। আর এ কারণেই তিনি সঙ্গতভাবে 'শায়েরুর রাসূল' বা রাসূলের কবি নামে খ্যাতি লাভ করেন।

কবি কা'ব বিন যুহায়ের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামূলক জঘন্য কবিতা রচনা করার অপরাধে রসূলুল্লাহ (সা.) তার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করেন। সে ব্যক্তিই যখন

ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কবিতা بَانَتْ سُعَادُ (বানাত সুআ'দ) রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে আবৃত্তি করা শুরু করলেন এবং পড়তে পড়তে যখন উচ্চারণ করলেন,

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلٌ۔

অর্থাৎ, রসূল আমার পূর্ণ আলোর বলয়
আঁধারের পথ উজ্জ্বল হলো তাতে
খাপ খোলা এক মুক্ত সে তরবারী
ভারতের তা চকচকে ধার যাতে।

রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে থামিয়ে দিয়ে সংশোধন করে দিলেন এই বলে যে, ভারতের তরবারী নয় বরং আল্লাহর তরবারী। রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে শুধু ক্ষমাই করেন নি; বরং খুশির আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান স্বরূপ নিজ দেহের চাদরটি তাকে উপহার দেন।

আরবি সাহিত্যে রসূলুল্লাহ (সা.) এর বাগ্মিতা ও অলংকারের অতুলনীয় অবদান

আরবি সাহিত্যে সাবলীলতা ও ভাষা-নৈপুণ্য আনয়নে রসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদিসের অসাধারণ ও ব্যাপক অবদান রয়েছে। আর কবি- সাহিত্যিকরা হাদিস থেকে গ্রহণ করেছেন ভাষার অনুপম রচনাশৈলী। রসূলুল্লাহ (সা.) শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয় বরং শব্দ ও বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি (সা.) বলেন,

أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

অর্থাৎ আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক ভাষা অর্থাৎ বিদ্যাসাগর দান করা হয়েছে। (মুসলিম) যেমন- যুদ্ধ খুব ভয়ানক আকার ধারণ করলে তিনি বলতেন-

اَلْآنُ حَمِىَ الْوَطِيْسُ

(চুলা গরম হয়ে গিয়েছে) আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজনে বলতেন-

يَا خَيْلَ اللّٰهِ اِرْكَبِىْ

(অর্থাৎ হে আল্লাহর অশ্ব! আরোহণ কর) । আরো একটি বাগ্মিতাপূর্ণ ও আলংকারিক উক্তি-

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ، طَالِبُ الْعِلْمِ وَ طَالِبُ الدُّنْيَا

অর্থাৎ দু'জন ভিখারী কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, জ্ঞান অন্বেষণকারী ও দুনিয়ার অন্বেষণকারী।

সমাজ ও মানবতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা.) এর রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি

রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবনে সংস্কৃতি বলতে মানব জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুপরিচালিত ও অনিন্দ্য সুন্দর প্রকাশকে মনে করতেন। আহারে, বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, আলাপ-আলোচনায়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি নিজেও তাঁর সঙ্গী সাহাবীদের মধ্যে শৃঙ্খলাময়, সুষ্ঠু ও সুন্দর অবস্থান পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে এ দুনিয়ার সংস্কৃতি জগতের শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক বলা হয়। রসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও অত্যন্ত সুন্দর বদনের অধিকারী বলে সর্বদাই চিরুণী দ্বারা তাঁর দীর্ঘ কেশ ও পরিমিত দৈর্ঘের শ্মশ্রুকে পরিষ্কার রাখতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নামাযের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা মাজন করতেন। তিনি সর্বদাই সুগন্ধি ব্যাবহার করতেন। তাঁর চলার সময় তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে অগ্রসর হতেন এবং তাঁর পার্শবর্তী লোকদের চলার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন না। কিছু সাহাবী তাঁর (সা.) কাছে রাস্তায় মানুষের চলাচলের স্থানে বসে সময় কাটানোর অনুমতি চাইলে তিনি এই শর্তে অনুমতি দেন যে, তারা পথচারীদের অধিকার প্রদান করবে। তাঁর (সা.) দ্বারা কোন মানুষ তো নয়ই বরং কোন ক্ষুদ্র প্রাণীও সামান্য কষ্ট পায়নি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের তিনি ছিলেন পরম হিতাকাঙ্খী। পরিচিত কিংবা অপরিচিত হোক তাঁর পূর্বে কেউই সালাম দিতে পারে নি। তিনি বলেছেন, পরিচিত কিংবা অপরিচিত যেই হোক তাকে তুমি সালাম অর্থাৎ শান্তি কামনার মাধ্যমে সম্ভাষন কর। এমনকি কারো বাড়িতে প্রবেশ করতে হলে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে।

সালামের প্রতিউত্তর না পেলে তিন বার সালাম দিবে। তারপরও প্রতিউত্তর না পেলে চলে আসবে। বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজে একজন মানুষের জন্য রসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির যে শিক্ষা বাতলিয়ে দিয়েছেন, আমরা যদি পশ্চিমা বিশ্বের অপসংস্কৃতি পরিত্যাগ করে তাঁর (সা.) এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করে নিজেদের জীবন ঢেলে সাজাই তাহলে সমাজে অপচয়, বৈষম্য-ভেদাভেদ, দারিদ্র এবং পাপ কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। মোটকথা, জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় কল্যাণই তাঁর (সা.) শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে।

স্ত্রীদের সাথে রসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তম সংস্কৃতি

স্ত্রীদের সাথে তাঁর (সা.) সম্পর্কের রীতি-নীতি ছিল অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ, যা একেবারেই অতুলনীয়। একবার তিনি (সা.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে কৌতুকবশত: এবং আনন্দ দানের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন যাতে তিনি (সা.) হেরে যান। কিছুদিন পর আবার প্রতিযোগিতা হলে হযরত আয়েশা (রা.) হেরে যান। কারণ ছিল, প্রথমবার প্রতিযোগিতার সময় হযরত আয়েশা (রা.) গড়নে হালকা ছিলেন, আর দ্বিতীয় বারের সময় তিনি গড়নে ভারি হয়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম (সা.) এবার বললেন,

هٰذِهٖ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

অর্থাৎ এটি হল সেই হারের প্রতিশোধ (আবু দাউদ)। একবার ঈদের দিনে হাবশার অধিবাসীরা মসজিদে নববীর এক উন্মুক্ত মাঠে সামরিক কসরত প্রদর্শন করছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)- কে বলেন, তুমিও কি এই কসরত দেখতে চাও? হযরত আয়েশা (রা.) তা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি (সা.) তাঁকে নিজের পিছনে দাঁড় করিয়ে নেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর (সা.) পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর (সা.) এর কাঁধে চিবুক রেখে এবং তাঁর (সা.) এর গালে গাল লাগিয়ে এই খেলা উপভোগ করি। তিনি (সা.)ও আমার ভর সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি (সা.) বলতে লাগলেন, যথেষ্ঠ হয়েছে, এখন ঘরে চলে যাও। (বুখারী)

বস্তুত সমাজের এমন কোন অধ্যায় নেই, যেখানে জীবন তাঁর পবিত্র স্পর্শে স্বর্ণ খণ্ডে পরিণত হয়নি। জীবনের সকল দিকে, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানপ্রাপ্ত রাসূল (সা.) এর সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন শিক্ষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নর-নারীকে আশা নিয়ে বাঁচার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, মনুষ্যত্বের উত্তরণে সহায়ক হয়েছেন। তাঁর পবিত্র শিক্ষামালা ও সংস্কৃতিতে রয়েছে মানুষের জাগতিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক অনাবিল ও অনন্ত শান্তির প্রতিশ্রুতি। তিনি যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হলো:

০১. আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না, সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ কর।
০২. পিতা মাতার অবাধ্য হয়ো না, তাঁদের সম্মান কর।
০৩. যার যা প্রাপ্য তা পরিশোধ কর।
০৪. অপচয়কারী হয়ো না, কৃপণও হয়ো না, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর।
০৫. কন্যাদের হত্যা করো না, তাদের উত্তম প্রতিপালন কর।
০৬. ব্যাভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, প্রয়োজনে বিয়ে কর।
০৭. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, রক্ষা কর, ক্ষমা কর।
০৮. এতিমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।
০৯. চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন কর।
১০. পৃথিবীতে গর্বভরে চলবে না, অহংকার, গর্ব ও অকৃতজ্ঞতা চরম গর্হিত কাজ।
১১. সুদ গ্রহণ করো না। দরিদ্র নিরীহ লোকদের প্রতি অত্যাচার করো না।
১২. দরিদ্রকে দান কর গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও। আর দাসকে মুক্ত কর।
১৩. অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, অত্যাচারিত ও অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর। একতাবদ্ধ হয়ে বাস কর।
১৪. কাউকে ঘৃণা করো না। পাপীকে সংশোধন কর। পাপকে ঘৃণা ও বর্জন কর।
১৫. নারীকে যথাযথ মর্যাদা দাও। তাকে কেবল ভোগের বস্তু মনে করো না। মনে রেখ, সমগ্র মানবমণ্ডলী একটি পাখি স্বরুপ। পুরুষ ও নারী দুটি পাখা। একটি পাখার দ্বারা সে পাখি কখনো উড়তে পারে না।
১৬. সদা সত্য কথা বলবে। কখনো মিথ্যা বলবে না।
১৭. জাত, বংশ ও কুলের অহংকার করো না। আপন কর্মে প্রতিষ্ঠিত হও। কর্মই আসল।
১৮. শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা দাও।
১৯. চেষ্টা বৈ মানুষের জন্য কিছুই নেই।
২০. আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতিরই অবস্থা পরিবর্তন করে দেন না। যতক্ষণ না তারা নিজে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে। মানবতার প্রতিষ্ঠাকল্পে মানুষের জীবন থেকে অশ্লীলতা ও কদর্যতা দূর করে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে হবে। দরিদ্র ও নিপীড়িতদের প্রতি সদয় হতে হবে। তিনি (সা.) এর মতে, ধর্মের উদ্দেশ্য কেবল মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধান নয়, বরং অপরের দুঃখ ও কষ্টকে আপন করা ও তা অপনোদন করার চেষ্ঠা করাই মানুষের প্রতি মানুষের ভ্রাতৃত্বের লক্ষণ। মহানবী (সা.) মানবতার কল্যাণে এই সংস্কৃতির শিক্ষা দিয়েছেন:

   ১. সকল মানুষের মাঝে এক আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মাহাত্ম্য প্রচার কর।
   ২. মানব সমাজের সকল স্তরে সাম্যবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তোল।
   ৩. গরিবের সাহায্য কর ও দারিদ্রতা দূর কর।
   ৪. অবহেলিত নারী জাতির যথাযথ মর্যাদা দান ও দাসত্বের অবসান কর।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা পৃথিবীতে যত প্রকার অপসংস্কৃতি ও সামাজিক কদাচার রয়েছে তা পরিত্যাগ করে মহানবী (সা.) এর প্রদর্শিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে তথা বিদ্যাসাগরে অবগাহন করে মণি-মুক্তা আহরণ করি। কেননা, তাঁর (সা.) যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গিন অনুসরণ করার মধ্যেই জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। তথাকথিত ইসলামি আন্দোলনের মুখে পড়ে, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার গেঁড়াকলে আটকে পড়ে কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে জাতিকে এমন সাহিত্য-সংস্কৃতি হতে বঞ্চিত না করি যা হয়তোবা সমর্থন করতেন; আজ যদি আমাদের মাঝে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবিত থাকতেন। আসুন, আমরা বিকৃত ও খণ্ডিত ইসলাম নয় বরং অবিকল স্বর্ণখচিত ইসলামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুসরণ করি।

সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার প্রেক্ষাপট

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এ নবীর প্রতি দুরূদ এবং অনেক সালাম প্রেরণ কর কেননা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর ফিরিশতারাও এ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করে (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। (সূরা আহযাব : ৫৭)

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মর্যাদা প্রশ্নাতীত। যাঁকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা রহমত ও আশীষের ভাগী করেছেন, আর তাঁর ফেরেশতারা যাঁর (সা.) জন্য সর্বদা দুরূদ পাঠ করে, তাঁকে কেউ খাটো করতে পারে না। রসূল করীম (সা.) এসেছিলেন পৃথিবীর বুকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)এর তৌহিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু নির্বোধ মানুষ কালের বিবর্তনে বারবার সেই শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়। ধর্মের নামে কবর পূজা, মাজারে উপঢৌকন-সামগ্রী উৎসর্গ করা, রসূল করীম (সা.)-এর রূহ্ উপস্থিত হয় এই বিশ্বাসে মিলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানে দাঁড়ানো আর খাদ্য সমগ্রী বন্টন করা এ সবই ধর্মীয় রুসুম বা প্রথাবিশেষ অথচ জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা এ জাতীয় কোন ধরণের অনুষ্ঠান উদযাপনের শিক্ষা ইসলাম দেয় নি। এগুলোর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ ধরণের কিছু ছিল না। এগুলোকে পরবর্তীকালে ধর্মীয় সংস্কৃতিতে নতুন সংযোজন বা পারিভাষিকভাবে "বিদআত" বলা যায়।

রসূল করীম (সা.)-এর তৌহিদ প্রতিষ্ঠার সেই কাজটিকে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন ছাড়াই একমাত্র ঐশী সমর্থনে করে গিয়েছেন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন :

خُذُوا التَّوحِيْدَ وَالتَّوحِيْدَ يَا اَبْنَاءَ الْفَارِسِ

"খুযুত্তাওহীদা ওয়াত্তাওহীদা ইয়া আবনাআল ফারিস"

অর্থাৎ, হে পারস্য বংশোদ্ভুত! তওহীদ (একত্ববাদ) অবলম্বন কর।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক। তাঁর ভাষায় :

ربط ہے جان محمدؐ سے مری جاں کو مدام
دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے

রাব্‌ত হ্যায় জা-নে মুহাম্মদ (সা.) মেরী জাঁ কো মুদাম
দিল কো ওহ্ জাম লাবা-লাব্ হ্যায় পিলায়া হাম নে।

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ের সাথে মোর হৃদয়ের সম্পর্ক চিরন্তন, কানায় কানায় প্রেম সুধায় ভরা পেয়ালা পান করিয়েছি আমি (দুররে সামীন)।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামা'ত শিরক্ ও বিদ'আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে মহানবী (সা.)-এর জন্মবার্ষিকী তথা "মিলাদুন্নবী (সা.)" পালন করার পরিবর্তে "সীরাতুন্নবী (সা.)" জলসা উদযাপন করি। এটি বছরের যে কোন তারিখে উদযাপন করা যায়। এই জলসা উদযাপনের পেছনে রয়েছে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

১৯২৮ সন। যা আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বছর। শুধু তাই নয় মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত একটি বছর। এ বছরেই হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার ভিত্তি রচিত হয়। যা বিশ্বজুড়ে তো বটেই বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরে তুমুল সাড়া জাগিয়ে তোলে। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় এই মহতী জলসার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পবিত্র হৃদয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার ঠিক এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯২৭ সনে।

এটি সে সময়ের কথা যখন হযরত আকদাস রসূল করীম (সা.)-এর উপরে বিভিন্ন ধর্মের পক্ষ থেকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় আঘাত হানা হচ্ছিল। সে যুগে আর্য সমাজী রাজপাল অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় রসূল করীম (সা.) এর পবিত্র জীবনীতে এবং সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় সহানুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে 'রঙ্গিলা রসূল' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে। এই পুস্তকটি মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে এমন সব বাজে কথা, মিথ্যার বেসাতি ও উস্কানিমূলক বিবৃতিতে

ভরপুর ছিল যার ফলে রাষ্ট্রপক্ষ তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। এই মামলা শুনানি চলাকালেই অমৃতসরের হিন্দু সম্প্রদায়ের পত্রিকা 'বর্তমান'-এ একই বছরের মে মাসে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় আবারো একটি উস্কানিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। যেখানে আর্য দেবী শরণ শর্মা উপাখ্যানাকারে রসূল করীম (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) একজন নারী আসক্ত এবং কামনা বাসনার পূজারী হিসেবে চিহ্নিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

শুধু তাই নয় বরং পশুতুল্য নরাধম শরণ শর্মা এই প্রবন্ধে হুযুর (সা.) এবং তাঁর (সা.) পরিবারের সদস্যদের বিষয়ে বিকৃত ও কুরুচীপূর্ণ বর্ণনা তুলে ধরে। আর এসবের ফল হিসেবে যা হবার তাই হলো অর্থাৎ সমগ্র দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে এর প্রত্যুত্তরে

رسول کریمؐ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کیا اب بھی بیدار نہ ہونگے

অর্থাৎ, রসূল প্রেমের দাবীদাররা কি এখনো জেগে উঠবে না?" শীর্ষক একটি পোস্টার প্রকাশ করেন। (১০ জুন, ১৯২৭)

তিনি (রা.) এখানে বলেন : "হে ভাই সকল! অত্যন্ত ব্যথাভরা হৃদয় নিয়ে আমি আপনাদেরকে আবারো বলছি যে বীর-বাহাদুর সেই ব্যক্তি নয় যে লড়াই করে; সে তো ভীরু কারণ সে আপন প্রবৃত্তির কামনা বাসনার স্তুপে পদদলিত। বীর তো সেই ব্যক্তি যে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় ও অটল এবং তা পূর্ণ করা অবধি সে তা থেকে পিছপা হয় না। সুতরাং ইসলামের উন্নতিকল্পে তিনটি বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হবে। প্রথমত: আপনারা খোদাভীতি অবলম্বন করবেন এবং ধর্মকে খামখেয়ালিপনার দৃষ্টিতে দেখবেন না। দ্বিতীয়ত: আপনাদেরকে ইসলাম প্রচারে পূর্ণ আকর্ষণ রাখতে হবে আর এ কাজে নিজ প্রাণ, সম্পদ উৎসর্গ করা থেকে পিছু হটবেন না। তৃতীয়ত: আপনারা মুসলমানের সামাজিক ও আর্থিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য পরিপূর্ণ তৎপরতা প্রদর্শন করবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না যতক্ষণ না মুসলমানরা এই পিষ্টকারী দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে যায়। এ অঙ্গীকার করে আপনারা তদানুযায়ী জীবন যাপন করবেন"।

এই লেখার শেষাংশে হুযুর উদাত্ত ভাষায় আহ্বান জানান "আছে কি কোন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় যা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের এলাকার সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হবে"। (আল ফযল পত্রিকা, ১০ জুন ১৯২৭, পৃষ্ঠা ৬-৮)

এই পোস্টারটি সমগ্র ভারতে এক রাতেই সেঁটে দেয়া হলো। এই প্রবন্ধটি সারা দেশে সাড়া জাগানো আলোড়ন তৈরি করল আর এ কারণে সরকারকে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বেশ বেগ সামলাতে হলো। কিছু দিনের মধ্যে এই পোস্টারটি বাজেয়াপ্ত করা হলো কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কার্যত বুমেরাং হলো অর্থাৎ এই বাজেয়াপ্তকরণ মূলতঃ রসূলপ্রেমিকদের হৃদয় থেকে রসূল প্রেম ও ভালবাসা মুছে ফেলা তো দূরের কথা বরং তা পূর্বের চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি হয়ে তাদের মনোজগতে উত্তাল ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়তে লাগল। সরকারকেও তাই "বর্তমান" এর সেই নোংরা ও অপবিত্র সংখ্যাকে বাজেয়াপ্ত করতে এবং তার সম্পাদক এবং প্রবন্ধ রচয়িতার নামে মামলা পরিচালনার তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান করতে হয়।

হযরত আকদাস খলিফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উদ্ভূত পরিস্থিতি সাপেক্ষে রসূল করীম (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশ জুড়ে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযান ছিল ইসলামী প্রতিরোধের এক অদ্ভুত নিদর্শনস্বরূপ। যা ইসলামের বিরোধীদের বিজয়যাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে শুধু দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ভূমিকা পালন করে নি বরং পৃথিবী জুড়ে রসূল করীম (সা.)-এর সকল প্রেমিকদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হুযুরের অস্থিরতা ও ব্যথাভরা মন কেবল মাত্র এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং তিনি (রা.) একে অপরের প্রতি কাদা ছুড়োছুড়ির সংস্কৃতি লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনের উপর আলোকপাত না করা হবে আর তাঁর (সা.) বিশ্বজগতের প্রতি অনুগ্রহ নিয়ে আলোচনা, সভা-সমাবেশ দেশে-দেশে, নগরে-বন্দরে, অলি-গলিতে না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদী দুর্গে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে চলমান আক্রমণ রীতিমত অব্যাহত থাকবে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবতায় রূপদানের লক্ষে তিনি (রা.) "সীরাতুন্নবী (সা.)" জলসা উদযাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি স্বয়ং বলেন :
"রসূল করীম (সা.)-এর উপর আক্রমণ করার স্পর্ধা এ কারণে হচ্ছে যে, তারা রসূল করীম (সা.)-এর জীবনী সম্বন্ধে অজ্ঞ। এর একটি মাত্র চিকিৎসা রয়েছে আর তা হলো রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনী নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা করা এবং এত জোরালোভাবে বক্তৃতা প্রদান করা যার ফলে ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশুও যেন রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। আর কেউ যেন তাঁকে (সা.) নিয়ে কুমন্তব্য বা কুৎসা রটনা করার দুঃসাহস দেখাতে না পারে। প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই ভেবে শত্রু আক্রমণ করে থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি বা সতর্ক ব্যক্তির সামনে কেউ আক্রমণ করে না কারণ সে প্রতিরোধ করবে। সুতরাং সমগ্র ভারতের সমস্ত মুসলমানদেরকে ও অমুসলিমদেরকে রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে জানানো আমাদের কর্তব্য আর এ লক্ষ্যে সবচেয়ে ভাল ও কার্যকরী প্রক্রিয়া হচ্ছে রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে প্রতি বছর বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষে একই দিনে আলোকপাত করা হবে যেন সারা দেশে সাড়া পড়ে যায় এবং অমনোযোগী ব্যক্তিরা জেগে ওঠে"। (আল ফযল, ১০ জানুয়ারি ১৯২৮, পৃষ্ঠা ১-২)

তিনি (রা.) আরো বলেন :
"রসূল করীম (সা.) সেই সমস্ত মহাপুরুষদের মাঝে অন্যতম

যার সম্বন্ধে জনৈক কবি বলেছেন :

آفتاب آمد دلیل آفتاب

আফতাব আমাদ দালিলে আফতাব
অর্থাৎ, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ

সূর্য ওঠার প্রমাণ কি? এটিই যে, সূর্য উঠেছে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, সূর্য যে উঠেছে এর প্রমাণ কি? তবে তাকে বলা হবে যে সূর্য স্বয়ং উদিত। তো এমন কিছু সত্তা রয়েছে যেগুলো স্বয়ং নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে আর রসূল করীম (সা.)-এর সত্তা এমন সত্তাসমূহের মাঝে অন্যতম বরং এ কথা বলা উচিত যে, আজ অবধি যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আর ভবিষ্যতেও যত মানুষ জন্মাবে সকলেই রসূল করীম (সা.)-এর অধীনে থাকবে এবং তিনি (সা.) সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। কেউ রসূল করীম (সা.)-এর উপর আপত্তি উত্থাপন করলে একমাত্র সে নিজের জীবন বিপন্ন করেই এ কাজ করতে পারে আর বিকৃত ঘটনাবলির মাধ্যমে সে ব্যক্তিই প্রভাবিত হতে পারে যে নিজে সঠিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে অজ্ঞ। রসূল করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সমুচিত উত্তর দেয়া এই আক্রমণ প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা নয় বরং আমরা যেন রসূল করীম (সা.)-এর জীবনী অধ্যয়নের জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং তারা যেন এ বিষয়ে সঠিকভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। তারা রসূল করীম (সা.)-এর জীবনী পাঠ করলেই বুঝতে পারবে যে রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র সত্তা শুধুই জ্যোতি: আর এই পবিত্র সত্তার প্রতি আপত্তি উত্থাপনকারী নিজেই অন্ধ”। (আল ফযল, ৪ মে ১৯২৮, পৃষ্ঠা ৫)

বিস্তারিত কর্মসূচি

এই জাতিগত ও সমষ্টিগত লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) এক মূল্যবান ও বিস্তারিত কর্মসূচী প্রস্তাব করেন যার চুম্বক অংশ নিচে তুলে ধরছি :

প্রথমত: প্রতি বছর রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্বাচন করে বিশেষভাবে সেগুলোর উপরে আলোকপাত করা হবে। ১৯২৮ সনের পূর্বে “সীরাতুন্নবী (সা.)” জলসার জন্য তিনি (রা.) তিনটি বিষয় প্রস্তাব করেন। (ক) মানবজাতির জন্য রসূল করীম (সা.) এর আত্মত্যাগ, (খ) রসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবন, (গ) বিশ্ব মানবতার প্রতি মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ।

দ্বিতীয়ত: এই বিষয়সমূহের উপরে আলোচনা বা বক্তৃতা করার জন্য তিনি (রা.) ১৯২৮ সনের সালানা জলসাতে এমন এক হাজার নিবেদিত ব্যক্তিদের আহ্বান জানান যারা বক্তৃতা করার পূর্বে প্রস্তুতির জন্য এখানে আসবেন যেন তাদেরকে বিষয়বস্তুর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া যায়।

তৃতীয়ত: তিনি (রা.) “সীরাতুন্নবী (সা.)” জলসাতে বক্তৃতা করার জন্য মুসলমান হওয়ার কোন শর্ত রাখেন নি। কারণ মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সমগ্র বিশ্বের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়াই। তাই এখনো যারা বিশ্বের প্রতি মহানবী (সা.)-এর এই অকৃত্রিম সম্পর্ককে অনুভব করতে পারে নি তারা সেই সুযোগ লাভ করবে। সুতরাং অমুসলমানদের মধ্যে যে কেউ মনে করবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবজাতির জন্য অনুগ্রহস্বরূপ আর সে তার বিশ্বাস নিজ ভাষায় এই জলসাতে তুলে ধরবে তবে সে সাদরে আমন্ত্রিত এবং তাদের পক্ষ থেকে দেয়া বক্তৃতা এই জলসাকে করবে আরো প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়। কাজেই এই জলসা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক উপলক্ষস্বরূপ। (আল ফযল, ১০ জানুয়ারি, ২ পৃষ্ঠা কলাম ২)

চতুর্থত: অমুসলিমদেরকে মহানবী (সা.)এর জীবন নিয়ে সুষ্ঠু গবেষণার সাথে যুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি (রা.) ঘোষণা করেন যে, অমুসলিমদের মাঝে বক্তৃতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদেরকে যথাক্রমে একশত রূপী, পঞ্চাশ রূপী ও পঁচিশ রূপী দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। (আল ফযল, ৫ জুন ১৯২৮, পৃষ্ঠা ১)

পঞ্চমত: হুযুরের সামনে যেহেতু “মিলাদুন্নবী” জলসার প্রথাগত প্রভাবশুণ্য এবং সামাজিকতামাত্র অনুষ্ঠানের গুটিকতক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তে “সীরাতুন্নবী” জলসার বিশেষ জ্ঞানগর্ভ ও সার্বজনীন স্বপ্ন ছিল। তাই তিনি (রা.) এই জলসার জন্য ১২ই রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে বছরের অন্য যে কোন দিনগুলিকে বেশি উপযুক্ত আখ্যায়িত করেছেন। তাই ১৯২৮ সনে তিনি (রা.) ১লা মুহাররম তারিখ অনুযায়ী ১৩৪৭ হিজরী মোতাবেক ২০শে জুন তারিখকে “সীরাতুন্নবী (সা.)” উদযাপনের ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে শিয়া সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে ২০জুন তারিখের পরিবর্তে ১৭ জুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়। (আল ফযল, ৪ মে ১৯২৮)

এই হলো “সীরাতুন্নবী (সা.)” জলসার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট। মুসলমান হিসেবে রসূল করীম (সা.)-কে জানার ও তাঁকে (সা.) নিয়ে গবেষণা করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিধর্মীরা মহানবী (সা.) কে নিয়ে নোংরা প্রবন্ধ বা ব্যঙ্গচিত্র কিংবা বিকৃত চলচ্চিত্র যাই করুক না কেন প্রকৃত সত্যের সন্ধানীরা যেন আমাদের কাছে এসে সত্যিকারের মুহাম্মদ (সা.)-কে চিনতে পারে। কারণ, আমাদের জাতীয় কবি মুহাম্মদ প্রেমিকদের হৃদয়ের প্রেমকে যথার্থই তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় :

“নবী মোর পরশ মণি / নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যে জন / সেই তো দো-জাহানের ধনী”।
(কাজী নজরুল ইসলাম)

আর যারা মুহাম্মদের (সা.) উম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নূর (জ্যোতিঃ) থেকে বঞ্চিত আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সুমতি দিন। (আমীন)

নারী মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

মূল: হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)

অনুবাদ: মাওলানা রশিদ আহমদ   শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমার কাছে আবেদন করা হয়েছে, আমি যেন আল-ফযলের বিশেষ সংখ্যার জন্য প্রবন্ধ লিখি। আমি মনে করি, এই সংখ্যা, যাতে রসূল করীম (সা.)-এর সুউচ্চ মান ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে এর জন্য প্রবন্ধ রচনা করাও পূণ্যের কাজ। সুতরাং আজকাল ভীষণ ব্যস্ততা এবং সেই সাথে অসুস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি দিক এত চিত্তাকর্ষক যে, মানুষ দ্বিধান্বিত হতে বাধ্য হয় কোনটি গ্রহণ করব আর কোনটি ছাড়ব। বাছাই করতে গিয়ে চোখ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়। তবে আমি বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে, তাঁর (সা.) ব্যবহারিক জীবনের সর্বোতকৃষ্ট দিকটি বাছাই করেছি। অর্থাৎ তিনি (সা.) কিভাবে দুনিয়াকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন যা দীর্ঘকাল যাবত পৃথিবীর গলার হার হিসেবে শোভা বর্ধন করছিল। আর সেটি হলো মহিলাদের দাসত্ব।

রসূল করীম (সা.)-এর আগমনের পূর্বে মহিলারা সকল দেশে দাসী এবং পরাধীন ছিল। তাদের দাসত্ব এমন ছিল যে, দাসী মৃত্যুবরণ করলেও তার দাসত্ব বিলীন হতো না কেননা দাসীর সন্তান মুক্তির স্বাদ পরিপূর্ণভাবে লাভ করতে পারত না। যদিও এতে কোন সন্দেহ নাই, সর্বদা নারী জাতি স্বীয় রূপ-লাবণ্য বা বুদ্ধিমত্তার জোরে কিছু পুরুষের উপর প্রাধান্য কায়েম করে আসছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। কেননা এসব তারা অধিকার হিসেবে লাভ করেনি বরং এগুলো ব্যতিক্রম ছিল। আর এই ব্যতিক্রমী স্বাধীনতা কখনও সঠিক স্পৃহা জাগ্রত করার কারণ হতে পারে না।

রসূল করীম (সা.)-এর আর্বিভাব আজ থেকে সাড়ে তের শত বছর পূর্বে হয়েছিল। তখন পর্যন্ত কোন ধর্ম এবং জাতি মহিলাদের এমন স্বাধীনতা প্রদান করেনি যা তারা নিজেদের অধিকার হিসেবে ভোগ করতে পারত। নিঃসন্দেহে কিছু দেশ যেখানে কোন প্রকার আইন কানুন ছিল না সেখানে সবাই সকল প্রকার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু একেও স্বাধীনতা বলা যায় না বরং একে উচ্ছৃঙ্খলা বলা যায়। স্বাধীনতা হলো তা যা সভ্যতা ও সামাজিক রীতি-নীতির কায়দা-কানুনের চাহিদা নিবারণ করে অর্জিত হয়। সেই আইন-কানুন ভঙ্গ করে যা অর্জিত হয় তাকে স্বাধীনতা বলা যায় না কেননা তা উচ্চাকাঙ্খা বা বীরত্ব সৃষ্টির পরিবর্তে হীনমন্যতা সৃষ্টির কারণ হয়।

রসূল করীম (সা.)-এর যুগে এবং তার পূর্বে মহিলাদের এমন অবস্থা ছিল যে, সে নিজের সম্পত্তির মালিক ছিল না, তার স্বামীকে তার সম্পত্তির অধিকারী মনে করা হতো। তাকে তার পিতার সম্পত্তি থেকে কোন অংশ দেয়া হতো না। তাকে তার স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণীও মনে করা হতো না। যদিও কিছু কিছু দেশে তার জীবদ্দশায় সে তার সম্পত্তির রক্ষক হতে পারত। যখন তার বিবাহ কোন পুরুষের সাথে হতো তখন তাকে সারাজীবনের জন্য সেই পুরুষের অধিকারভুক্ত বলে গণ্য করা হতো। আর স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার কোন এখতিয়ার তার ছিল না কিন্তু তার স্বামীর অধিকার ছিল তাকে পৃথক করে দেয়ার। মহিলার যত কষ্টই হোক না কেন তার কোন অধিকার ছিল না তার স্বামীর থেকে পৃথক হওয়ার। স্বামী যদি তাকে ছেড়ে দেয় আর তার সাথে যদি কোন যোগাযোগ না রাখে বা কোথাও যদি পালিয়ে যায় তবে তার অধিকার রক্ষার কোন আইন ছিল না। সেই মহিলার কর্তব্য মনে করা হতো যে, সে তার সন্তানদের এবং নিজেকে সংযত রাখবে আর কাজ কর্ম করে নিজের এবং সন্তানদের ভরণপোষণ করবে। স্বামীদের এই অধিকার ছিল, সে তার স্ত্রীকে মারপিট করবে কিন্তু স্ত্রী টু শব্দটিও করতে পারবে না। কিছু কিছু দেশে স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারভুক্ত মনে করা হতো। তারা অনুগ্রহের ছলে বা দাম নিয়ে তাকে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে সম্বন্ধ করিয়ে দিত। কিছু কিছু স্থানে তাকে স্বামীর সম্পত্তি মনে করা হতো। কিছু স্বামী তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত বা জুয়া আর শর্তে বাজি হিসেবে স্ত্রীকে উপস্থাপন করত। এই পদ্ধতি স্বামীর অধিকারভুক্ত বলে গণ্য হতো। মহিলারা তাদের সন্তানদের উপর কোন প্রকার অধিকার দাবি করতে পারত না স্বামীর ঘরে থাকা অবস্থায় বা তার থেকে পৃথক অবস্থায়। মহিলারা সংসারের বিষয়াবলীতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারত না। ধর্মীয় ভাবেও মনে করা হতো তারা কোন মর্যাদা রাখে না, চিরস্থায়ী অনুগ্রহরাজিতেও তাদের কোন অংশ নাই। এর ফলে স্বামী তার স্ত্রীর সম্পত্তি হেসে খেলে উড়িয়ে দিত আর তার খোরপোষের কোন উৎস না রেখেই ছেড়ে দিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্বামী তাকে অনুমতি দিত সেই হতভাগিনীরা নিজ সম্পত্তি থেকে সদকা-খায়রাত বা আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য সহযোগিতা করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। আর সেই সকল স্বামী যাদের দৃষ্টি তাদের সম্পত্তির উপর থাকত এ ব্যাপারে অনুমতিও দিত না। পিতা-মাতা যাদের সাথে তার নাড়ি ছেড়া সম্পর্ক তাদের সম্পত্তি

থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হতো, অথচ মেয়েরাও তাদের সেরূপ স্নেহ-মমতার অধিকারিণী যেরূপ ছেলেরা। যে পিতা-মাতা এই ত্রুটি দেখে সংশোধনের উদ্দেশ্যে মেয়েদেরকে তাদের জীবদ্দশায় কিছু দিত তা নিয়ে তাদের স্বামীদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত। কেননা ছেলে তো এটি ভাবতো না যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সকল সম্পত্তির সে ওয়ারিশ হবে তবে সে এটি অনুভব করত যে তার পিতা-মাতা তার তুলনায় মেয়েদেরকে বেশি দিয়েছে। একই ভাবে স্বামী, যার সাথে পরম আস্থার সম্পর্ক হয়ে থাকে তার সম্পত্তি থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখা হতো। স্বামীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো কিন্তু সেই নারী যে তার স্বামীর অন্দরমহল ও জীবনভর সাথী, স্বামীর আয়-উপার্জনের বহুলাংশ জুড়ে তার পরিশ্রম ও কাজ কর্ম জড়িয়ে ছিল তার সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হতো। অথবা তাকে তার স্বামীর সকল সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হতো কিন্তু সে তার অংশ ব্যয় করা থেকে বঞ্চিত থাকত। সে সেই সম্পত্তির আয় থেকে তো খরচ করতে পারত কিন্তু সেটির কোন অংশ ব্যবহার করতে পারত না। আর এভাবেই তারা অনেক সদকায় জারিয়া-তে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত রয়ে যেত। স্বামীরা তাদের উপর যতই অত্যাচার নির্যাতন করুক না কেন তারা তাদের থেকে পৃথক হতে পারত না। আর এমন কিছু জাতি ছিল যাদের মহিলারা যদি স্বামীদের থেকে পৃথক হতে চাইত তবে এমন সব শর্তারোপ করা হতো যে অনেক ভদ্র মহিলা পৃথক হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করত। উদাহরণস্বরূপ পৃথক হওয়ার এমন শর্ত ছিল যে, স্বামী বা স্ত্রীর ব্যাভিচার প্রমানিত হতে হবে সেই সাথে অত্যাচার করা হয় এটিও সাব্যস্ত হতে হবে। এর চেয়েও বড় অবিচার ছিল, অনেক ক্ষেত্রে যখন মহিলাদের স্বামীর সাথে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত তখন তাদের পরিপূর্ণ মুক্তি দেয়ার পরিবর্তে কেবল মাত্র পৃথক থাকার অধিকার প্রদান করা হতো। আর এটি এক প্রকার শাস্তি ছিল কেননা এভাবে তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিজ জীবন যাপনে বাধ্য হতো। আবার এটিও হতো, স্বামী যখন ইচ্ছা তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারত কিন্তু মহিলাদের স্বামীদের থেকে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার কোন অধিকার ছিল না। যদি স্বামী তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন না করে পৃথক হয়ে যায় বা দেশ ছেড়ে চলে যায় আর কোন খবরা-খবর না নেয় তবে জীবনভর তার স্বামীর অপেক্ষা করতে মহিলাদেরকে বাধ্য করা হতো। তার জীবন দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যয় করার কোন অধিকার ছিল না। বৈবাহিক জীবন তার জন্য আরাম আয়েশের পরিবর্তে গলার কাটা হয়ে দাঁড়াত। সে পরিবারের সকল কাজ-কর্ম করত আবার স্বামীর জন্য অপেক্ষাও করত। স্বামীর যা আবশ্যকীয় কাজ অর্থাৎ সংসারের খরচ নির্বাহ করা এটিও স্ত্রীর কাঁধে পড়ত, সেই সাথে সন্তানদের দেখভাল করা তাদের লালন-পালন করা যা মহিলাদের স্বীয় দায়-দায়িত্ব তাও তাদের উপর অর্পিত হতো। একদিকে হৃদয়ের অশান্তি অপরদিকে নারীর দায়-দায়িত্ব সব কিছু একটি নিরীহ জীবনের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো।

মহিলাদের মারপিট করা স্বামীর বৈধ অধিকার হিসেবে গণ্য করা হতো। স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে বলপ্রয়োগ করে বিয়ে দেয়া হতো বা কোন ব্যক্তির কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করা হতো। এমনকি স্বামী তার স্ত্রীকে বিক্রি করে দিত। পাণ্ডের মত সুখ্যাতি সম্পন্ন শাহজাদা তার স্ত্রীকে জুয়া খেলায় হারিয়ে বসে আর দেশের প্রচলিত আইনের সামনে দ্রুপদীর মত শালীন ভদ্র শাহজাদী টু শব্দটিও করতে পারে নি। বাচ্চাদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় মায়েদের কোন রায় গ্রহণ করা হতো না। তাদের সন্তানদের উপর তাদের কোন অধিকার প্রদান করা হতো না। মাতা-পিতার মাঝে ছাড়াছাড়ি হলে সন্তানদের পিতার অধীনে দিয়ে দেয়া হতো। পারিবারিক বিষয়াবলীতে মহিলাদের কোন হস্তক্ষেপ সহ্য করা হতো না, স্বামীর জীবদ্দশাতেও না আর মৃত্যুর পরেও না। স্বামীর ইচ্ছা হলেই তাকে ঘর থেকে বের করে দিত আর তারা উদ্ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত।

রসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে এই সকল অত্যাচারের মূলোৎপাটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, খোদা তা'লা আমাকে মহিলাদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, মানুষ হিসেবে নর ও নারী সমান। যখন তারা একত্রে মিলেমিশে কাজ করবে তখন মহিলাদের উপর পুরুষদের কিছু অধিকার লাভ হয় অনুরূপভাবে পুরুষদের উপরও মহিলাদের কিছু অধিকার লাভ হয়। পুরুষদের মত মহিলারাও সম্পত্তির মালিক হতে পারে। স্ত্রীর সম্পত্তি ব্যবহার করার কোন অধিকার স্বামীর নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না স্ত্রী স্বপ্রণোদিত হয়ে তাকে কিছু দান করবে। স্ত্রীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্পদ নেয়া বা এমন পরিস্থিতি তৈরী করে স্ত্রীর নিকট থেকে সম্পদ নেয়া অনুচিত যাতে স্ত্রী লজ্জায় তার স্বামীকে তা দিতে বাধ্য হয়। স্বামীও যদি কিছু উপহার স্বরূপ তাকে দেয় তবে সেই উপহার মহিলার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে আর স্বামী তা পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সেও তার পিতা-মাতার সম্পদের সেভাবে উত্তরাধিকারিণী হবে যেভাবে ছেলে তার পিতা-মাতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। তবে হ্যাঁ, যেহেতু পুরুষের উপর পরিবারের দায়িত্বভার অর্পিত থাকে আর মহিলার উপর কেবল স্বীয় দায়িত্বভার অর্পিত থাকে তাই সে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক পাবে। অনুরূপ মাতা তার পুত্রের সম্পদ থেকে সেভাবেই অংশ লাভ করবে যেভাবে পিতা লাভ করে থাকে। যদিও অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং দায়-দায়িত্বের দিক থেকে কখনও পিতার সমান আর কখনও কম পেয়ে থাকে। সন্তান-সন্ততি থাক বা না থাক স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদেরও উত্তরাধিকারিণী হবে যাতে তাকে অন্যের নিকট হাত পাততে না হয়। নারীর বিবাহ নিঃসন্দেহে একটি পুতঃপবিত্র বন্ধন। নর-নারী পারস্পরিক অকৃত্রিম বন্ধন স্থাপনের পর তা ছিন্ন করা সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এটি হতে পারে না যে, স্বামী-স্ত্রীর স্বভাবের মাঝে ভয়ানক মতপার্থক্য থাকা বা ধর্মীয়, শারীরিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক বিভাজন থাকা সত্ত্বেও সে বাধ্য হবে যে, এই বন্ধন অটুট রাখার জন্য তার জীবন

বিনষ্ট করবে আর তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে বসবে। যখন এমন বিভাজন সৃষ্টি হবে আর পুরুষ ও মহিলা ঐক্যমতে পৌঁছাবে যে, এখন তারা মিলেমিশে বসবাস করতে পারছে না, তখন তারা এই অঙ্গীকারকে সন্তুষ্টচিত্তে বাতিল করবে। যদি পুরুষ এমন ধ্যান-ধারণা রাখে অর্থাৎ পৃথক হতে চায় আর মহিলা যদি না চায় এবং পরস্পরের মাঝে যদি কোন ভাবেই সমঝোতা না হয় তবে একটি পঞ্চায়েত তাদের মাঝে মীমাংসা করবে। সেই পঞ্চায়েতের দু'জন সদস্য থাকবে, একজন পুরুষটির পক্ষের অপরজন মহিলাটির পক্ষের। যদি তারা এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, পুরুষ ও মহিলাটির এখনও কিছুদিন একত্রে থাকা উচিত। তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সমীচীন হবে তাদের বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলা। কিন্তু এভাবেও সমঝোতা না হলে পুরুষটি মহিলা থেকে পৃথক হতে পারবে। এমন পরিস্থিতিতে পুরুষটি মহিলাটিকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না এমনকি তাকে মোহরানাও পরিপূর্ণ আদায় করতে হবে। এর বিপরীতে যদি মহিলাটি পুরুষটি থেকে পৃথক হতে চায় তবে সে কাজী বা বিচারকের কাছে আবেদন করবে। কাজী যদি দেখেন এর পিছনে কোন দুরভিসন্ধি নেই, তবে তিনি তাকে বিচ্ছেদের অনুমতি দিবেন। আর এই ক্ষেত্রে মহিলাটির উচিত হবে তার স্বামীর ধন-সম্পদ বা মোহরানা যা তার কাছে গচ্ছিত আছে তা ফিরিয়ে দেয়া। এছাড়াও যদি মহিলাটির স্বামী তার নির্ধারিত অধিকার প্রদান না করে বা তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে দেয় বা তার বিছানা পৃথক করে দেয় তবে এর সময় নির্ধারণ করে দেয়া উচিত। আর যদি সে অর্থাৎ স্বামী চার মাস বা এর অধিক এই কর্মকাণ্ড জারী রাখে তবে তাকে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বা তালাক দিতে বাধ্য করতে হবে। আর যদি স্বামী মহিলার ভরণ পোষণ দেয়া বন্ধ করে দেয় অথবা তাকে ছেড়ে কোথাও চলে যায় আর তার কোন খবরা-খবর না রাখে তবে তাদের বিবাহ ফাসেখ বা বাতিল আখ্যায়িত করা হবে (ইসলামী ফিকাহবীদগণ তিন বছর সময় নির্ধারণ করেছেন) এবং মহিলাটিকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি দিয়ে মুক্ত ঘোষণা করা হবে। আর স্বামীকে নিজ স্ত্রী-সন্তানের খরচ নির্বাহের দায়ভার অর্পণ করা হবে। নিজ স্ত্রীকে সঙ্গত ভর্ৎসণা করার অধিকার স্বামীর আছে। তবে ভর্ৎসণা যখন শাস্তির রূপ লাভ করবে তখন লোকদের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা আবশ্যক। সাক্ষীদের সামনে অপরাধ প্রকাশ করবে এবং সাক্ষ্য প্রদান এর ভিত্তি হবে। আবার শাস্তি যেন এমন না হয় যে, দীর্ঘদিন এর প্রভাব বজায় থাকবে। স্বামী তার স্ত্রীর মালিক নয়। সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না, চাকরানীর মত রাখতে পারবে না, তার স্ত্রী তার আহারাদির ভাগীদার, স্ত্রীর সাথে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করবে আর স্বামী যে শ্রেণীর তার থেকে নিম্ন শ্রেণীর আচরণ করা বৈধ হবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীর উপর কোনরূপ অধিকার খাটাতে পারবে না। সে স্বাধীন, ভালোমন্দ বিচার করে নিজে বিয়ে করতে পারবে এতে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই। তাকে নির্দিষ্ট স্থানে থাকতেও বাধ্য করা যাবে না। কেবল চার মাস দশ দিন পর্যন্ত তাকে স্বামীর ঘরে অবশ্যই থাকতে হবে যেন এই সময়ের মধ্যে সেসব পরিস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যায়, যা তার ও তার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বছরব্যাপী ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না যদি না সে স্বেচ্ছায় যায়। এই সময়ের মধ্যে যেন সে নিজের প্রচেষ্টায় নিজ আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয় তবে স্বামী নিজে ঘর থেকে পৃথক হয়ে যাবে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেয়া যাবে না কেননা ঘর মহিলাদের অধিভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। সন্তানের শিক্ষাদীক্ষায় মাও অংশ নিবে এবং তার মতামত গৃহিত হবে। সন্তান সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মাকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। স্তন্যপান করানো, সন্তানের দেখাশোনা করা প্রভৃতি বিষয়াবলীতে তার মতামত গ্রহণ করা উচিত। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মাঝে বনিবনা না হলে যদি তারা পৃথক হতে চায় তবে শিশু সন্তান মায়ের সাথে থাকবে। তবে হ্যাঁ, সন্তান বড় হলে শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির জন্য পিতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সন্তান মায়ের কাছ থাকবে তার খরচ পিতা বহন করবে। এমনকি মা তার সন্তানের পিছনে যে সময় ব্যয় করছে আর যে কাজ করছে তারও আর্থিক প্রয়োজনাদি স্বামীর মেটানো উচিত।

নারী স্বতন্ত্র পদমর্যাদা রাখে আর তারা সকল প্রকারের ধর্মীয় পুরস্কার লাভে সক্ষম। মৃত্যুর পর তারা সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করবে এবং এই দুনিয়াতেও রাজত্বের বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আর এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।

এই হলো সেই শিক্ষা যা রসূল করীম (সা.) সে সময়ে দিয়েছিলেন যখন দুনিয়াতে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধ্যান-ধারণা প্রচলিত ছিল। তিনি (সা.) এ সকল আদেশ প্রদান করে মহিলাদের সেই দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন যার শৃঙ্খলে তারা হাজার বছর ধরে আবদ্ধ ছিল। প্রতিটি দেশে এই দাসত্বকে বরণ করে নেয়া হয়েছিল। সকল ধর্ম নারীর কাঁধে দাসত্বের জোয়াল রেখেছিল। একজন ব্যক্তি হাজার বছরের এই দাসত্বের শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে দেন আর দুনিয়ার সকল নারীকে মুক্তির স্বাদ দেন। মাতাদেরকে মুক্ত করে সন্তানদেরও দাসত্বের মনমানসিকতা থেকে মুক্ত করেন আর উঁচু ধ্যান-ধারণা ও বৃহৎ আকাঙ্খার স্পৃহা বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু দুনিয়া এই সেবার কদর করে নাই। যে বিষয়গুলো তাদের জন্য অনুগ্রহ ছিল তা যুলুম-অত্যাচার হিসেবে আখ্যায়িত করে। তালাক ও খোলাকে তারা ফিতনা ফাসাদ আখ্যা দেয়, সম্পদের উত্তরাধিকার হওয়াকে খান্দান বা বংশীয় মূল্যোবোধের বিনাশ, মহিলাদের স্বতন্ত্র অধিকারকে পারিবারিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণ বলে আখ্যায়িত করে। আর তারা যুগ যুগ ধরে এমনটি করেই চলল। তের শত বছর পর্যন্ত তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এই দূরদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তির কথা নিয়ে হাসি-তামাশা করে আর তাঁর (সা.) শিক্ষাকে স্বভাববিরুদ্ধ আচার-আচরণ বলে তুলে ধরে। অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসল যখন খোদার

কালামের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হওয়া এবং যারা সভ্য ও সুশীল হওয়ার দাবী করত তারা রসূল করীম (সা.)-এর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার আদেশাবলীর অনুসরণ করবে। তাদের সকল রাষ্ট্র এক এক করে নিজ আইন-কানুন পরিবর্তন করে রসূল করীম (সা.) বর্ণিত রীতি নীতির অনুসরণ করে।

ইংরেজী আইনে তালাক ও খোলা নেয়ার ক্ষেত্রে যে কোন এক পক্ষের ব্যভিচার সেই সাথে অত্যাচার ও মারপিট প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক ছিল। সেই আইন ১৯২৩ সালে পরিবর্তন করে তালাক ও খোলার জন্য কেবল ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়া যথেষ্ট বলে স্বীকার করা হয়।

নিউজিল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে এই আইন জারী করা হয় যে, স্ত্রী সাত বছর যাবত মানসিক ভারসাম্যহীন থাকলে বিয়ে ফাসাখ বা বাতিল করা যেতে পারে। ১৯২৫ সালে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, স্বামী বা স্ত্রী যদি নর-নারীর অধিকার আদায় না করে তবে তালাক বা খোলা নেয়া যেতে পারে এবং তিন বছর যাবত খোঁজ খবর না নিলে তালাক বৈধ বলে আখ্যা দেয়া হয় (হুবহু ইসলামী ফিকাহবিদগণের অনুকরণ করেছে তবে তের শত বছর ইসলামের উপর আপত্তি করার পর)।

অষ্ট্রিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড রাজ্যে আইন করা হয়, পাঁচ বছর মানসিক ভারসাম্যহীন থাকলে তালাক নেয়া যাবে। তাসমানীয়াতে ১৯১৯ সালে আইন পাশ করা হয় ব্যভিচার, চার বছর পর্যন্ত খোঁজ-খবর না নেয়া, মাতলামো এবং তিন বছর পর্যন্ত সম্পর্কহীনতা, বন্দীত্ব, মারপিট এবং মানসিক ভারসাম্যহীন এসব তালাকের শর্ত। ভিক্টোরিয়া রাজ্যে ১৯২৩ সালে আইন পাশ করা হয় যে, স্বামী যদি তিন বছর পর্যন্ত কোন যোগাযোগ না রাখে, ব্যভিচার করে, ব্যয়ভার বহন না করে, কঠোরতা করে, বন্দী থাকে, মারপিট করে বা মহিলারা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, মানসিক ভারসাম্যহীন, কঠোরতা এবং ফিৎনা-ফাসাদে লিপ্ত হয় তবে তালাক ও খোলা নেয়া যেতে পারে।

পশ্চীম অস্ট্রেলিয়ায় উপরে বর্ণিত আইনগুলো ছাড়াও গর্ভবতী মহিলার বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ইসলামও একে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে)। কিউবা দ্বীপ ১৯১৮ সালে ব্যভিচারে বাধ্যকরা, মারপিট, গালমন্দ করা, সাজা প্রাপ্ত হওয়া, মাতলামো করা, জুয়ার অভ্যাস, অধিকার প্রদান না করা, খরচ বহন না করা, চিররোগী অথবা পরস্পরের মাঝে বনিবনা না হলে এগুলো তালাক বা খোলা নেয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ বলে আইন পাশ করা হয়।

ইটালীতে ১৯১৯ সালে আইন করা হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সম্পত্তির মালিক হবে এবং তা থেকে তারা সদকা খায়রাত করতে পারবে, এমনকি তা বিক্রিও করতে পারবে (তখন পর্যন্ত ইউরোপে মহিলাদেরকে তাদের সম্পত্তির মালিক মনে করা হতো না)। মেক্সিকো ও আমেরিকাতেও উপরে উল্লেখিত কারণগুলোকে তালাক বা খোলা নেয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ বলে স্বীকার করা হয় আর সেই সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়াকেও সেই কারণগুলোর অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এই আইন ১৯১৭ সালে পাশ হয়েছে। পর্তুগালে ১৯১৫ সালে, নরওয়েতে ১৯০৯ সালে, সুইডেনে ১৯২০ সালে, সুইজারল্যাণ্ডে ১৯১২ সালে তালাক ও খোলার অনুমতি দিয়ে এমন আইন পাশ করা হয়েছে। সুইডেনে ১৮ বছর পর্যন্ত সন্তানের খরচ প্রদানে পিতাকে বাধ্য করা হয়। ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকাতে এখনও পর্যন্ত সন্তানের অধিকার পিতাকে দেয়া হয় তবে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আইন সংশোধন করা শুরু হয়ে গেছে। বিচারক মহিলাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানো শুরু করেছে এবং পুরুষকে খরচাদী প্রদানে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই আইনে অনেক ত্রুটি রয়েছে পুরুষের অধিকার আদায়ে অনেক বেশী দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মহিলাদের তার সম্পত্তি খরচের অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু সেই সাথে কিছু কিছু রাজ্যে এই আইনও পাশ করা হয়েছে যে, স্বামী যদি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয় তবে তার খরচ নির্বাহ করা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক।

মহিলাদের ভোট প্রদানের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে। তাদের থেকে জাতীয় বিষয়াবলীতে পরামর্শ নেয়ার পথ উন্মোচিত হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশ প্রদানের সাড়ে তের শত বছর পরে ঘটছে এবং এখনও অনেক কিছু ঘটতে বাকী আছে। এমন বহু দেশ আছে যেখানে মহিলাদের পিতা-মাতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলে মনে করা হয় না। এছাড়াও আরও অনেক এমন অধিকার রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কিন্তু তারা এই নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে। তবে সেই দিন বেশী দূরে নয় যখন দুনিয়া এই বিষয়াবলীতেও রসূল করীম (সা.)-এর নেতৃত্বের অনুবর্তিতা করবে যেভাবে অন্য বিষয়াবলীতে অনুবর্তিতা করেছে। আর এভাবেই নারী জাতির মুক্তির জন্য রসূল করীম (সা.)-এর লড়াই প্রভাব বিস্তার করবে এবং চূড়ান্ত ফল বয়ে আনবে।

(আল ফযল, ১২ই জুন ১৯২৮; আনওয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১-২৪১)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা মূলত যা বুঝায় তা হল, কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বেই তা অনুমান করা - যার ফলে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। পবিত্র কুরআন করীমে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) ও হযরত ইয়াকুব (আ.)-কে বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন করীমের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তা অগণিত ওহী-ইলহাম লাভের দরুন নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআন করীমের সূরা ইউসুফে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, "তুমি বলে দাও যে এটা আমার পথ। আমি আল্লাহ তা'লার দিকে আহ্বান করি। আমি বিচক্ষণতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-ও যে আমার অনুবর্তিতা করে।" অতএব, বিচক্ষণতা হল এক প্রকারের ঈমানী শক্তি।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে চল। কেননা, মুমিন খোদা তা'লার নূর দ্বারা দেখে থাকে।" কুরআন করীম হতে জানা যায়, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণরূপে ঝুঁকে এবং দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে তার ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়।

আমরা দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) ফজরের নামাযের পূর্বে এই দোয়ার মাধ্যমে দিন শুরু করতেন যে, "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার ভাষাকে আলোকিত কর, আমার শ্রবণশক্তিকে আলোকিত কর, আমার দৃষ্টিকে আলোকিত কর, আমার পিছনকে আলোকিত কর, আমার সম্মুখকে আলোকিত কর, আমার উপর আলোকিত কর এবং আমার নিচে আলোকিত কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান কর।"

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বিচক্ষণতার এই সাক্ষ্যও কুরআন দেয় যে, তিনি (সা.) অভাবীকে তার চেহারা দেখেই চিনে ফেলতেন। একদা তিনি (সা.) মসজিদে নববীতে জুমু'আর খুৎবা প্রদান করছিলেন; এমন সময় এক অভাবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন তিনি (সা.) উপস্থিত সবাইকে সদকা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। সদকা দেয়া হয়ে গেলে তিনি (সা.) সেই অভাবীকেও দুটি কাপড় দান করেন। সেই অভাবী ব্যক্তি তা থেকেও একটি কাপড় সদকা হিসেবে দিয়ে দেয়। তখন তিনি (সা.) তাকে ধমক দিয়ে বলেন যে, তোমার কাপড় ফিরিয়ে নাও। অর্থাৎ, তাকে বলতে হয় নি যে, সে অভাবী। বরং তিনি (সা.) তাকে দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, এই ব্যক্তিটি অভাবে আছে।

কুরআন করীমে আঁ-হযরত (সা.)-এর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (সা.) মুনাফিকদেরকে তাদের আচরণ দ্বারাই চিনে ফেলবেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) একদা সম্পদ বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তিকে তিনি কিছুই দান করেন নি। আমি আবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কাছে তো এই ব্যক্তিকে মুমিন মনে হয়। তিনি (সা.) বলেন, মুসলমান! অর্থাৎ, এর চেয়েও অধিক আনুগত্য প্রদর্শনকারী। অতঃপর আমার বার বার সুপারিশ করার ফলে তিনি (সা.) বলেন, হে সা'দ! আমি কাউকে তখন দান করি যখন তার চেয়েও কেউ আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাকে ফিৎনা থেকে বাঁচানোর জন্য এ ভয় দিয়ে থাকি যাতে আল্লাহ তা'লা না আবার তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করে।

আঁ-হযরত (সা.) নিজ সাহাবীগণের মর্যাদা ও তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কেও খুব অবগত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত সম্পর্কে বলেন, (খলীফা হিসেবে) আল্লাহ তা'লা (আবু বকর ব্যতীত) অন্যদেরকে এমনিতেই রদ করে দিবেন এবং মুমিনগণও তাকে ছাড়া অন্যদেরকে অস্বীকৃতি জানাবে। এই কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.)-এর একান্ত আবেদন সত্ত্বেও যে, ইমামতি যেন হযরত উমর (রা.) করেন, তিনি (সা.) প্রত্যুত্তরে এটাই বলেছেন, যেখানে আবু বকর উপস্থিত আছে সেখানে অন্য কারও ইমামতি করা যৌক্তিক নয়।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও আঁ-হযরত (সা.) আপন বিচক্ষণতার অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি (সা.) নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত খাওয়ানোর পর ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্ত আবু লাহাব তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে তিনি (সা.) পুনরায় দাওয়াত দেন এবং দাওয়াত খাওয়ানোর পূর্বেই ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে সঙ্গ দেয় নি।

অনুরূপভাবে, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে অন্যান্য গোত্রগুলোকে

ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর পূর্বে তিনি (সা.) এ কথাই বলেছিলেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পিছনে সৈন্যদল তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তুত, তোমরা কি এ কথায় বিশ্বাস করবে? সবাই যখন মিলিতভাবে এই কথার সত্যায়ন করে তখন তিনি (সা.) সবাইকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে ঐশী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন।

প্রারম্ভিক যুগে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আরকাম (রা.)-এর ঘরই মূলত তবলীগের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় হযরত তোফায়েল বিন উমর (রা.) এবং হযরত আবু যার গাফ্ফারী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন মোখালেফাত চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তিনি (সা.) একান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে নিজ সাহাবাদেরকে হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ প্রদান করেন। দূর্বল মুসলমান ও দাস-দাসীরা যখনই কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে তখনই তিনি (সা.) সবাইকে ধৈর্য ধারণ ও দোয়া করতে বলেছেন। আর দোয়ার বদৌলতেই হযরত উমর (রা.) ও হযরত হামযা (রা.) ইসলাম কবুল করেছেন।

শে'বে আবু তালেবে তিন বছর বয়কটের জীবন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অতিক্রান্ত করেছেন। তাঁর (সা.) সহমর্মীদের কাছ হতে রাতের আঁধারে শস্যদানা ও খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করতেন এবং সুরক্ষার খাতিরে প্রতি রাতে তাঁর শোবার জায়গা পরিবর্তন করা হতো।

অতঃপর আমরা দেখতে পাই, বিরোধীতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি (সা.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু তারাও এ আহ্বান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় পুনরায় মক্কায় এসে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন প্রভাবশালী নেতার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী ছিল। এ লক্ষ্যে তিনি (সা.) মক্কার কতিপয় সর্দারের নিকট এই আহ্বান জানায় যে, আমায় আমার প্রভূর বাণী প্রচারের জন্য তোমাদের আশ্রয় প্রয়োজন। অন্যান্যরা অস্বীকৃতি জানালেও মুতয়াম বিন আদি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজ ছেলে ও ভাতিজার মাধ্যমে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করায় এবং পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করায়। আর আবু জাহল জিজ্ঞাসা করায় বলেন, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। আঁ-হযরত (সা.) মুতয়ামের মৃত্যুর পরও তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেছেন।

এটাও তাঁর (সা.) বিচক্ষণতা ছিল যে, তিনি (সা.) হজ্ব ও আরবের প্রসিদ্ধ মেলার সময় ইসলামের প্রচার করতেন। পরিণাম এটাই হয়েছে যে, ইয়াসরাব হতে আগত কিছু লোক এমন দিনেই ইসলাম কবুল করেছে।

মক্কায় যদি কারও জীবন সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ছিল তবে তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) তখনই হিজরত করেছেন যখন মক্কায় অসুস্থ, দূর্বল ও অসহায় মুসলমান সবাই হিজরত সম্পন্ন করে। হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজ বিছানায় রেখে যাওয়া এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর দরজায় কড়া না নেড়ে বরং তাকে জানালা দিয়ে ডেকে সফর শুরু করা এমন এক পরিকল্পনা ছিল যা অত্যন্ত ফলদায়ক সাব্যস্ত হয়। আর সফরের রাস্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি এতটাই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন যে কেবলমাত্র সুরাকা ছাড়া আর কেউই তা অনুধাবণ করতে পারে নি।

অত:পর, আমরা দেখতে পাই, তিনি (সা.) হিজরতের সময় হযরত আব্বাস (রা.) (যিনি ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)-কে মক্কায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন যেন মক্কায় আগত হাজীদের পানি পান করানো ও তাদের নিরাপত্তা বিধানের বরকতপূর্ণ দায়িত্ব হতে বনু হাশেম গোত্র বঞ্চিত না হয়। সেই সাথে মক্কার অবস্থা এবং কুরাইশদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.)-কে অবহিত করাও তাদের দায়িত্ব ছিল। অনুরূপভাবে মক্কার দূর্বল মুসলমানদেরকে নিরবে সাহায্য-সমর্থন করাও তার জন্য আবশ্যক ছিল।

হিজরতের পর 'মুয়াখাত' (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) প্রতিষ্ঠা করা এবং মদীনা সনদ প্রবর্তন করাও তাঁর সুমহান বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। 'মুয়াখাতের' মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয় এবং মদীনা সনদের মাধ্যমে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবার পাশাপাশি মদীনার অন্যান্য গোত্রগুলোর মাঝে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

মদীনায় তিনি (সা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সমস্ত গোত্রগুলোর মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলনীতি জারি করেন এবং নিজ আমল দ্বারাও এগুলোর বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, তিনি (সা.) যখন এক জানাযা দেখে দাঁড়িয়ে যান তখন কেউ কেউ এ কথা বলেছিল, এ তো এক ইহুদীর জানাযা। তখন তিনি (সা.) এটাই বলেছিলেন, সে কি মানুষ ছিল না!

আঁ-হযরত (সা.) ইহুদীদের বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সত্ত্বেও মদীনা সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন এবং ইহুদীদের প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন। তিনি (সা.) তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করেছেন।

আঁ-হযরত (সা.) অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে মদীনা সনদের পরই মদীনার আশে-পাশের গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক চুক্তি স্থাপন করেন যে, মদীনার বাইরের কোন অপশক্তি দ্বারা যদি কোন গোত্র আক্রান্ত হয় তবে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা তাদের এলাকায় নিরাপদে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছে। অপরদিকে কাফেরদের জন্য এ সুবিধা সহজলভ্য ছিল না।

আঁ-হযরত (সা.) বিভিন্ন আরব গোত্রগুলোর সাথে তাদের মানসিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন এবং তাদের প্রথা অনুযায়ী তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। এমনকি

তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছেন এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক আচরণ করেছেন। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম কবুল করে তা প্রত্যাহার করেছে। যখন আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি ইয়েমেন হতে আসে তখন প্রথমেই তিনি (সা.) তাদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন আউফকে বলেন, তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় আল্লাহ তা'লা পছন্দ করেন। অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই প্রদান করেন, অথচ সেই ব্যক্তি প্রশ্নগুলো করতে ইতস্তত বোধ করছিল। তাদের এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং বিভিন্ন বিষয় হতে নিষেধ করেন। তারা বলে, তাদের আবহাওয়া ভিন্ন, তাই তারা যদি মদ পান না করে তবে তাদের পেট ফুলে যাবে এজন্য তাদের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ করা উচিত। এ কথা শুনে তিনি (সা.) হাতের ইশারায় বলেন, আমি যদি তোমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করি তবে তোমরা এর চেয়েও বেশি ফায়দা উঠাবে। এমনকি তিনি একথাও বলেন, এতে যদি খেজুর ভিজিয়ে খাও তবুও তোমরা একে-অপরকে তলোয়ার নিয়ে দৌড়াবে। আর কারও কারও তলোয়ার অপরকে খোড়া করে দিবে। একথা শুনে সবাই হেসে উঠে এবং অনেকে এ কথাও বলে যে, সত্যিকার অর্থেই এমনটি হয়েছে আর এ কারণেই অনেকে খোড়া। অত:পর তিনি (সা.) তাদের এলাকায় পাওয়া যায় এমন কয়েকটি খেজুরের কথা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেন। আর একথাও বলেন যে, তোমাদের এলাকার সবচেয়ে ভাল খেজুর হল 'বার্নি', যা রোগকে দূর করে আর এর মধ্যেও কোন রোগ নেই।

বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি আসে। সে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। কিন্তু তাদের সর্দার কায়েস বিন আলেম তার অসাধারণ সহিষ্ণুতার দরুণ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। আঁ-হযরত (সা.) তাকে দেখেই চিনে ফেলেন এবং বলেন, এ হল বেদুঈনদের সর্দার।

আঁ-হযরত (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আমরা সেইসব মজলিস হতেও পাই যেখানে লোকজন তাঁকে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। এমনি মজলিস হতে কিছু ঘটনা আমি তুলে ধরছি :

একদা এক ব্যক্তি এই আবেদন নিয়ে আসে যে, আমার স্ত্রী এক কৃষ্ণ বর্ণের সন্তান জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি (সা.) বললেন, তোমাদের কি উট আছে? সে সাথে সাথেই উত্তর দিল - হ্যাঁ, আছে। তারপর তিনি (সা.) বলেন, কি কি রঙের আছে? সে বলল লাল রঙের আছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলোর মধ্যে গোধুম বর্ণের আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে । তিনি (সা.) বলেন, লাল রঙের উটের মধ্যে গোধুম বর্ণ কি করে এল? সে বলল, হয়তবা এগুলোর বাপ-দাদার মধ্যে কেউ এই রঙের ছিল। তখন তিনি (সা.) বলেন, ঠিক অনুরূপভাবে তোমার ছেলেও হয়তবা তার পূর্ব পুরুষদের মধ্য হতে কারও রঙ পেয়েছে। এভাবেই আঁ-হযরত (সা.) আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে বংশ পরম্পরায় মানুষের জন্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে এই বিষয়ের সমাধান করেছেন ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) একদা হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'লার নিকট কোন আমল অধিক পছন্দনীয় ? তিনি (সা.) বলেন, সময়মত নামায আদায় করা। অত:পর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা এবং আল্লাহ তা'লার পথে জিহাদ করা। অনত্র তিনি (সা.) একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল সেই কাজ যা নিয়মিত করা হয়। অর্থাৎ, তিনি (সা.) প্রতিটি শিক্ষা অবস্থাভেদে প্রদান করেছেন। যা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে।

একবার এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) বলেন, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আর আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল সেই খুশী যা এক মুসলমানকে প্রদান করা হয়।

এক ব্যক্তি জিহাদে যাবার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, হ্যা, জীবিত আছে। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তাদের সেবা করার মাধ্যমে জিহাদ কর।

এক রাগী স্বভাবের ব্যক্তি তাঁর নিকট আবেদন করে যে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি (সা.) বলেন, রাগ করবে না। তার বার বার আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি (সা.) একই কথা বলেছেন।

অনুরূপভাবে, হযরত আবু যার গাফ্ফারী (রা.) যিনি একাকীত্ব প্রিয় ছিলেন, তাকে তিনি (সা.) নসীহত করতে গিয়ে বলেন, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। মন্দের প্রতিদান ভালোর মাধ্যমে প্রদান কর। আর যখন রান্না কর তখন তরকারীতে ঝোল বেশি করে দাও যেন প্রতিবেশীদেরও দিতে পারো।

যখন সূরা জুমু'আর আয়াত নাযিল হয় যেখানে 'আখারীনদের' মধ্যে একটি জামাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে রসূলে করীম (সা.) আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর তিনবার জিজ্ঞেস করার পর তিনি (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ঈমান যখন সপ্তর্ষী মণ্ডলে পৌঁছে যাবে তখন পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় তা পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে তিনি (সা.) একথা বলে দিয়েছেন, ঈমান সপ্তর্ষী মণ্ডলে পৌঁছে যাবার যুগ হচ্ছে তাঁর (সা.)-এর পুনরাগমনের যুগ। দ্বিতীয়ত, তিনি (সা.) স্বয়ং আবির্ভূত হবেন না, বরং হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর বংশ হতে অর্থাৎ,

পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন যিনি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক হবেন এবং তৃতীয়ত, সেই একনিষ্ঠ সেবক এসেই ইসলামকে পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। অর্থাৎ, ইসলামের হারানো শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবেন।

একদা তিনি (সা.) একথাও বলেন, উম্মতে মুসলেমাহ ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামী হবে কেবলমাত্র একটি জামাত ব্যতীত। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন, সেটি কোন জামাত? তিনি (সা.) বলেন, যারা আমার ও আমার সাহাবাদের পথে থাকবে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ উত্তর।

একদা তিনি (সা.) 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে আসেন। গত হয়ে যাওয়া সাহাবাদের জন্য দোয়া করেন এবং জামাতে আখারীনদের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেনঃ আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা এটাই যে, আমি যদি এই চোখেই আমার ভাইদের দেখতে পেতাম! সাহাবারা বলল, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হল তারা যারা এখনো আসে নি। সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতের সেই সমস্ত লোকদের কীভাবে চিনবেন যারা এখনো পৃথিবীতে আসে নি। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা 'পান্‌জ কুলইয়ান' ঘোড়াকে (যাদের পায়ে ও কপালে বিশেষ সাদা চিহ্ন থাকে) যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে দেখ তাহলে কি চিনতে পারবেনা? সাহাবারা বলল, হ্যাঁ, চিনতে পারব। তখন তিনি (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে ওযু'র কারণে আমার সেই উম্মতের চেহারা ও পা উজ্জ্বল হবে আর আমি 'হাউযে কাওসারে' তাদের অগ্রভাগে থাকব।

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের থেকেও কি কেউ উত্তম হবে, যখন কিনা আমরা জিহাদ ও ধর্মীয় সেবার অধিক সুযোগ পেয়েছি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এক জাতি আছে যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা আমার উপর ঈমান আনবে, যদিওবা তারা আমাকে দেখে নি।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে, হযরত রসূল করীম (সা.) সারা জীবন যে কাজই করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি কথা ও কাজ তিনি (সা.) স্থান-কাল-পাত্রভেদে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পৃথিবীর বুকে প্রসারতা লাভ করে এবং ইসলামের বিজয়ের পথ সুগম হয়। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী যা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয়ই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

"হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবাত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কোরআন; এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম"

(তিরইয়াকুল কুলুব, পৃঃ ৯৯)

রসূল করীম (সা.)-এর কুরআন প্রেম

মাওলানা মোহাম্মদ আল হক
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মানবজাতির জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল কুরবতে এলাহী অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ। আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে? মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআন করীমে বলেন-

قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

অর্থাৎ তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) পরম দয়াময়। (সূরা আল ইমরান : ৩২) এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যদি আমাকে পেতে চাও, আমার ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণ কর। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে (সূরা আহযাব, ২২)। সুতরাং আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। নিম্নে আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কুরআনের সাথে সুগভীর ভালোবাসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করছি।

কুরআন করীম আল্লাহ তা'লার পবিত্র কালাম এবং সেই শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র হৃদয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি সেই পবিত্র কালাম যা শুনে আরবের বিখ্যাত কবি লাবিদ কবিতা লেখা ও বলা ছেড়ে দিয়েছেন। এটি সেই পবিত্র বাণী যা শুনে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এই পবিত্র কালামের প্রকৃত শান তখনই প্রকাশ হত যখন খোদার রসূল স্বয়ং তেলাওয়াত করতেন। হযরত রসূল করীম (সা.) পবিত্র কুরআন করীমের সাথে গভীর ভালোবাসা রাখতেন। স্বয়ং খোদা তা'লা বলেন-

رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ فِيهَا كُتُبٞ قَيِّمَةٞ

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল পবিত্রকৃত ঐশী পুস্তকাবলী পড়ে শোনায়। এতে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে (সূরা আল বায়্যিনাহ, ৩-৪)। রসূলুল্লাহ (সা.) যখন এই মনোমুগ্ধকর কালামের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন তখন আরশের খোদা তা'লাও তা পছন্দ করতেন। অতএব আল্লাহ তা'লা বলেন–

وَمَا تَكُونُ فِي شَأۡنٖ وَمَا تَتۡلُواْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ وَلَا تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إِذۡ تُفِيضُونَ فِيهِۚ

অর্থাৎ (হে রসূল!) তুমি যে কোন কাজে ব্যস্ত থাক না কেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের (এসব কাজে) নিমগ্ন থাকা অবস্থায় তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। (সূরা ইউনুস : ৬২)

আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কুরআন তেলাওয়াত পছন্দ করতেন। কারণ তিনি (সা.) এক বিস্ময় ও আকর্ষণ, কোমলতা, ভক্তি ও ভালোবাসার সাথে এই পবিত্র কালাম তেলাওয়াত করতেন। তাঁর (সা.) তেলাওয়াতের এরূপ মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ছিল যা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ

অর্থাৎ আমরা যাদেরকে এ কিতাব দান করেছি তারা তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে। এরাই প্রকৃতপক্ষে এর প্রতি ঈমান রাখে (সূরা আল বাকারা : ১২২)।

রসূল করীম (সা.) এই ঐশী আদেশ অনুযায়ী খুব সুন্দর, সুরেলা এবং তারতিল সহকারে এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন যাতে তেলাওয়াত যথাযথভাবে হয়ে যায়। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা.) তেলাওয়াত করার সময় প্রত্যেকটি আয়াতের পর থামতেন। সূরা ফাতেহাতে প্রত্যেকটি আয়াতে থামতেন, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' পড়ে থেমে যেতেন অতঃপর 'আর রাহমানির রাহীম' পড়ে থামতেন এরপর 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' পড়তেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আল্লাহ তা'লা নবী করীম (সা.)-এর কুরআন

তেলাওয়াত যেরকম মনোযোগ দিয়ে শুনতেন অন্য কোন কিছু শুনতেন না। যখন তিনি খুব সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে ও গুন্নাহ সহকারে উঁচ্চ স্বরে তা তেলাওয়াত করতেন। (মুসনাদ আহমদ)

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করতে হলে আমাদের উচিৎ আমরা যেন পবিত্র কুরআন করীম সুন্দর, সুরেলা ও তারতিল সহকারে থেমে থেমে তেলাওয়াত করি। রসূলে আকরাম (সা.) তেলাওয়াত করার সময় প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট এবং পৃথক করে পড়তেন। গভীর মনোযোগের সাথে এই আওয়াজ কখনো উঁচু হতো আবার কখনো নীচু। একবার কেউ একজন হুযুর (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হুযুর কোনটি উত্তম তেলাওয়াত? তিনি (সা.) বলেন- 'যা শুনে তোমার মনে হবে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে।' আর এরকম তেলাওয়াত একমাত্র তাঁর-ই হতো।

হযরত রসূল করীম (সা.)-এর চিন্তা-চেতনা, উঠা-বসা ও চলা-ফেরা সবই কুরআন ছিল। একবার এক সাহাবী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে প্রশ্ন করেন যে, হুযুর (সা.)-এর আদর্শ কেমন ছিল? উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, তোমরা কি কুরআন করীম পড় না, 'কানা খুলুকুহুল কুরআন' অর্থাৎ তাঁর (সা.) আদর্শ পবিত্র কুরআন মোতাবেক ছিল।

বিশেষ করে নাযিলকৃত তাজা কুরআনী ওহী নামাযের মধ্যে অধিকহারে তেলাওয়াত করতেন এবং পুনরাবৃত্তি করতেন। সাধারণত রাতের বেলাতেও তাঁর পবিত্র মুখে কুরআনের বাণী উচ্চারিত হতো। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন- কখনো কখনো রাতে হঠাৎ চোখ খুলে যেত তখন মুখে খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্বের আয়াত জারি হত-

وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

অর্থাৎ আর আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং প্রবল প্রতাপশালী। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এদুয়ের মাঝে যা-ই আছে (তিনি) এর প্রভু-প্রতিপালক। (তিনি) মহাপরাক্রমশালী (ও) অতি ক্ষমাশীল। (মুসতাদরেক আলাস সহীহাইন লিলহাকেম)

হুযুর (সা.) বাহনের উপর বসা অবস্থাতেও কুরআন করীম তেলাওয়াত করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রা.) বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী করীম (সা.)-কে উটের উপর বসা দেখলাম তখন তিনি (সা.) তেলাওয়াত করছিলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ
مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যেন আল্লাহ তোমার প্রতি আরোপিত পূর্বের এবং ভবিষ্যতের যাবতীয় ভুলত্রুটি তোমাকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা ফাতাহ : ২-৩)

তিনি (সা.) রাতের তৃতীয় প্রহরে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন। আর উঠা মাত্রই সূরা আল ইমরানের শেষের দশ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। এসব আয়াত বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতে বিদ্যমান নিদর্শনসমূহের উপর চিন্তা করা প্রভৃতি বিষয়সমূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। যার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে অজান্তেই খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। (বুখারী)

অনুরূপভাবে হুযুর (সা.) রাতে বিছানায় শোয়ার সময় কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তেলাওয়াত করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী করীম (সা.) কুরআনের শেষ তিনটি সূরা তেলাওয়াত করে হাতে ফুঁ দিতেন এবং নিজ শরীরে হাত বুলাতেন এরপর শুয়ে পড়তেন। (বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- রসূলুল্লাহ (সা.) শোয়ার পূর্বে সূরা আয-যুমার এবং সূরা বনী ইসরাঈলও তেলাওয়াত করতেন (মুসনাদ আহমদ)। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তিনি (সা.) সূরা আলিফ লাম মীম, সূরা আস-সিজদাহ এবং সূরা মুলক পড়তেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, শেষের ছয়টি সূরা তেলাওয়াত করে শুয়ে পড়তেন।

হযরত আওফ বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন- একবার আমার নবী করীম (সা.)-এর সাথে এক রাত ইবাদত করার সৌভাগ্য হয়। তিনি (সা.) শুরুতে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। তিনি (সা.) যখনই কোন রহমতের আয়াত পাঠ করতেন তখনই সেখানে থেমে দোয়া করতেন। আর যখনই কোন আযাবের আয়াত পড়তেন তখনই সেখানে থামতেন এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তিনি নামাযে কিয়ামের সমান রুকু করলেন যাতে তাসবিহ (পবিত্রতা) এবং তাহমিদ (প্রশংসা) করতে থাকলেন। এরপর কিয়ামের অনুরূপ সিজদা করলেন। সিজদাতেও অনুরূপ তাসবিহ ও দোয়া পাঠ করতে থাকলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে সূরা আল ইমরান তেলাওয়াত করলেন। এরপর প্রত্যেক রাকাতে একটি করে সূরা পড়তে থাকলেন। (আবু দাউদ)

'রমযানুল মোবারক' কুরআন অবতীর্ণের মাস। এ মাসে তাঁর (সা.) কুরআন তেলাওয়াত এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার আগ্রহ অত্যধিক হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- রসূলে আকরাম (সা.) নেক কাজে সবার থেকে অগ্রগামী ছিলেন এবং তাঁর এই শান রমযান মাসে বেশি পরিলক্ষিত হত। যখন রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, আর এই সাক্ষাৎ রমযানের প্রতিটি রাতে হতো তিনি রসূল করীম (সা.)-এর সাথে কুরআন করীম খতম করতেন। অর্থাৎ তাঁর (সা.) কাছ থেকে কুরআন শুনতেন এবং শুনাতেন। (বুখারী)

কুরআন তেলাওয়াত এবং খোদাভীতি

আল্লাহ তা'লা বলেন- যাদেরকে এর (অবতরণের) পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তাদেরকে যখন এটি পড়ে শোনানো হয় তখন তারা অবশ্যই অবনত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে (সূরা বনী

ইসরাঈল : ১০৮)। অন্য স্থানে এসেছে- যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করে, এ (বাণী পড়ে) তাদের শরীর শিউরে উঠে (সূরা আয যুমার : ২৪)। অর্থাৎ খোদা ভীতি সৃষ্টি হয়, আর আমাদের নবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি আর কে এই বিষয়ের সত্যায়নকারী হতে পারে? যিনি সবার থেকে অধিক খোদাভক্ত ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াত ও শুনার সময় তাঁর অবস্থাও এরূপ হতো। রসূলুল্লাহ (সা.) কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর গভীরে গিয়ে তেলাওয়াত করতেন এবং এর গভীর প্রভাব তাঁর শরীরে পরিলক্ষিত হতো। একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নিবেদন করলেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনার চুলে তো শুভ্রতা ঝলমল করছে। তিনি (সা.) বললেন- হ্যাঁ, সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, নাবা এবং আত তাকৃভীর আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে (তিরমিযী)। এসব সূরায় পূর্বের জাতিসমূহের উল্লেখ রয়েছে। যাদের উপর খোদার আদেশ-নিষেধ এবং রসূলের অস্বীকারের ফলে আযাব এসেছিল এবং তারা ধ্বংস হয়েছে।

হুযুর (সা.) সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন সাহাবাগণ নিরবে শুনতেন এবং মোহিত হয়ে যেতেন। একবার তিনি (সা.) সাহাবাগণকে সূরা রহমান তেলাওয়াত করে শুনান। সাহাবাগণ মোহিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে নিরবে শুনছিলেন। রসূল করীম (সা.) তেলাওয়াত শেষ করে নিরবতা ভেঙ্গে বলেন- আমি যখন জ্বীনদের একটি দলকে এই সূরা শুনিয়েছিলাম তখন তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন। আমি যখনই

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

আয়াত পড়তাম সেই দল উত্তরে বলত-

لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَ لَكَ الْحَمْدُ

"লা বিশাইয়িম মিন নি'মিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ওয়া লাকাল হামদ" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা তোমার অনুগ্রহসমূহের কোন কিছুই অস্বীকার করি না এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। (তিরমিযী)

হুযুর (সা.) কেবল নিজেই তেলাওয়াত করতেন না বরং অন্যের মুখ থেকেও তেলাওয়াত শুনতেন। আর ঐশী-বাণী শুনে রসূল করীম (সা.)-এর কণ্ঠ ভারী হয়ে যেত এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। একদিন হুযুর (সা.) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-কে বললেন- আমাকে কিছু কুরআনী আয়াত পড়ে শোনাও। তিনি (রা.) তেলাওয়াত করতে লাগলেন। যখন তিনি (রা.) এই আয়াতে পৌঁছলেন-

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

অর্থাৎ অতএব আমরা যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সবার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন (তাদের) কী দশা হবে? (সূরা নিসা : ৪২)। তিনি (সা.) নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না এবং চোখ থেকে অশ্রুর ফোঁটা পড়তে লাগল। হাতের ইশারায় বললেন- থাম। (বুখারী)

তাঁর খোদাভীতি এরূপ ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে তেলাওয়াত করতে শুনলেন যিনি সূরা মুযাম্মেল-এর এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন-

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا

অর্থাৎ আমাদের নিকট শিকল এবং জাহান্নাম রয়েছে, তখন হুযুর (সা.) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। (কনযুল উম্মাল)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক সফরে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমার রাত অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ হয়। তিনি (সা.) বিসমিল্লাহ পাঠ করা শুরু করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন এমনকি কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলেন। এরপর বিশ বার বিসমিল্লাহ পড়লেন; তিনি প্রত্যেক বার কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যেতেন। শেষে আমাকে বললেন, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ভাগা যার প্রতি রহমান ও রহীম খোদাও দয়া করে না। (ইবনে জাওযী)

রসূলুল্লাহ (সা.) কেবল নিজেই কুরআন তেলাওয়াত করেন নি বরং তাঁর প্রিয় উম্মতকেও তা শিখতে এবং তেলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

"খাইরুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কুরআন প্রেমের প্রকাশ অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেও হতো। কুরআন তাঁর আত্মার খোরাক ছিল। তাঁর হৃদয়ের অবস্থা এরূপ ছিল-

دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں
قرآں کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے

"দিল মে এহী হ্যা হারদাম তেরা সহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ ঘুমুঁ কা'বা মেরা এহী হ্যা"

(দুররে সামীন)

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে কুরআনের মাহাত্ম্য বুঝার এবং রসূলে আকরাম (সা.)-এর উত্তম আদর্শে চলার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দোয়া কবুলিয়্যাতের কিছু ঘটনা

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

খোদার প্রিয় বান্দারা পৃথিবীতে এসে মানুষকে খোদা তা'লার সাথে নিজেদের জীবন্ত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবনের আসল তাৎপর্য ও প্রকৃত বেহেশত ও জীবন্ত খোদার পরিচয় দিয়ে থাকেন। খোদা তা'লার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ও রসূল দুজাহানের বাদশাহ খাতামান্নাবীঈন রাহমাতুল্লিল আলামীন সৈয়্যদনা ও মাওলানা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আমাদের প্রতি তাঁর (সা.) অনুগ্রহ ও রহমতের একটি উজ্জ্বল দিক হলো তাঁর (সা.) দোয়া। প্রকৃত বিষয় হল দোয়ার মূল তত্ত্ব ও দোয়া কবুলিয়্যাত সম্পর্কে বিশ্বাস সর্বপ্রথম সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীবাসির মাঝে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, জুতার ফিতার প্রয়োজন হলেও নিজের প্রভুর নিকট যাচনা কর। তাঁর (সা.) প্রত্যেকটি মুহূর্তই ছিল দোয়া । তাঁর (সা.) পবিত্র জীবনে শত শত বরং সহস্র সহস্র দোয়া কবুলিয়্যতের ঘটনা রয়েছে। যার মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা হলো।

যদিও রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর যে কোন দিক বর্ণনা করার চেষ্টা করা মহাসমুদ্রকে অঞ্জলীর ভিতর আবদ্ধ করার চেষ্টা করারই নামান্তর। তবুও কিভাবে রসূলে আকরাম (সা.) নিজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য পেয়েছেন, কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রত্যেকটি দোয়া কবুলিয়্যাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আমরা যেন কল্যাণমন্ডিত হতে পারি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করা হলো।

[১]

মক্কায় যখন ইসলাম প্রচারের সূচনা হয় এবং বিরোধীতা শুরু হয় তখন কুরাইশ নেতাদের মাঝে উমর বিন হিশাম (আবু জাহ্ল) ও উমর বিন খাত্তাব শত্রুদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলো। রসূলে করীম (সা.)-এর হৃদয়ে ইসলামের স্বপক্ষে এই চরম শত্রুদ্বয়ের প্রতি দয়া হলো আর খোদা তা'লার সমীপে এই দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ্! এই দুই ব্যক্তি; উমর বিন হিশাম (আবু জাহ্ল) ও উমর বিন খাত্তাবের মধ্য থেকে যে কোন একজনের মাধ্যমে ইসলাম-এর সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি কর।" (তিরমিযি, কিতাবুল মানাকেব, বাবঃ ১৮)

অতঃপর পৃথিবী দেখেছে যে, এই হেদায়েতকারীর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন, যেই উমর ঘর থেকে উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে খোদার রসূলকে হত্যা করতে বের হয়েছিল সেই উমর ইসলামের সৌন্দর্য্য ও দোয়ার তলোয়ার দ্বারা নিজেই আহত হয়েছেন।

[২]

বদরের যুদ্ধে সেই মহান বিজয় ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুসলমানের যুদ্ধের ফল ছিল না বরং তা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দোয়ারই ফল ছিল যা তিনি বদর প্রান্তরের এক ঝুপরিতে বিগলিত চিত্তে তার প্রভুর সমীপে করেছিলেন। সেই দিন তিনি তার প্রভুকে না জানি কী কী দোহাই দিয়েছেন। তিনি (সা.) তাঁর প্রভুকে তৌহীদের দোহাই দিয়ে বলেন,

হে আমার প্রভু প্রতিপালক! সারা পৃথিবীর উপর মাত্র এই গুটি কয়েক লোক তোমার ইবাদতকারী।

হে আমার প্রভু! যদি এই লোক ক'টি আজ এই যুদ্ধে মারা যায়, তাহলে তোমার নাম নেওয়ার মত আর কে থাকবে এই ভূপৃষ্ঠে?

রসূলে করীম (সা.)-এর দোয়া এ জন্য ছিল না যে আমাদের এই ছোট জামাতকে তুমি রক্ষা কর তা না হলে আমরা সবাই মারা যাব, আমাদের নাম ও নিশানা পৃথিবীতে থাকবে না বরং তিনি এই জন্য দোয়া করেছেন, আমাদের এই ছোট জামাতের জয় পরাজয়ের কোন মূল্য নেই, কিন্তু এই একটি জামাতই পৃথিবীতে আছে যারা তোমার তৌহীদে বিশ্বাসী তাই তুমি এই জামাতকে রক্ষা কর। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো তোমার ও তোমার তৌহীদ যেন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেক চেষ্টার পর তোমার তৌহীদে বিশ্বাসী এই ছোট জামাতকে আমি একত্রিত করেছি এরা যদি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আমার চিন্তা হলো তোমার নাম নেয়ার লোক কোথা থেকে আসবে?

বদর প্রান্তরের ঝুপরির ভিতরে যে দোয়া করা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কবুল হলো আর ৩১৩ জন মুসলমান যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল অনভিজ্ঞ ও নিরস্ত্র; মুশরেকদের ১০০০ জন অভিজ্ঞ ও অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত সৈনিকের উপর বিজয় লাভ করে।

[৩]

হযরত সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পরেন, তখন তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হাযির হয়ে তাদের উট যবেহ করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর (রা)-এর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন, উট যবেহ্ করে তারপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? উমর (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ সকল উট যবেহ্ করে খেয়ে ফেলার পর লোকেরা কিরূপে বাঁচবে? তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাবারের বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর আমি আল্লাহ্র রসূল। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নম্বর ২৭৭৪)

[৪]

যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াসরাবে (মদীনার পূর্ব নাম) গেলেন তখন সেই এলাকাটিতে মহামারি অনেক বেশি হতো অর্থাৎ এলাকাটির আবহাওয়া ভাল ছিল না। এর ফলে বেশ কয়েক জন সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.), হযরত বেলাল (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) সহ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পরেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করেন, হে আমার প্রভু! এই মহামারিপূর্ণ এলাকার মহামারি দূর করে দাও এবং এই শহরের রিযিকে বরকত দান কর। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাবাহ্, বাব নম্বর ৭৫) এর পর মদীনা থেকে সব ধরণের মহামারী দূর হয়ে যায় এবং মদীনার আবহাওয়া অত্যন্ত ভাল সাব্যস্ত হয়। এই দোয়া কিভাবে পূর্ণ হয়েছে মদীনাবাসী এর চাক্ষুষ সাক্ষী।

[৫]

একবার মদীনায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ চলছিল। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মিম্বরের বরাবর দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন তাঁর দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ্ বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও। আনাস (রা.) বলেন আল্লাহ্র কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা বা মেঘের চিহ্ন কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মাঝে কোন ঘর বাড়ি ছিল না। আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ সাল'আ পর্বতের পিছন থেকে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং মধ্য আকাশে পৌছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পায়নি। তারপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুম'আর দিন সেই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা ঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়া করুন। আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন তার দু'হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর নয়, আমাদের আশে পাশে, টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর। আনাস (রা.) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (বুখারী, কিতাবুল ইসতেসক্বা, হাদীস নম্বর ৯৫৮)

[৬]

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-কে দশ বছর বয়সে তার পিতা-মাতা রসূল করীম (সা.)-এর ব্যক্তিগত খাদেম হিসেবে পেশ করেন। একদা হযরত আনাস (রা.)-এর মা উম্মে সুলায়েম (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল এই হলো আপনার খাদেম আনাস। আল্লাহ্র কাছে এর জন্য দোয়া করুন। তখনই মহানবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আনাসের মাল সম্পদ ও বংশে বরকত দান কর এবং যা কিছু তুমি তাকে দান করেছ তাতে বরকত দান কর। (বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত, বাব নম্বর ২৫)

হযরত আনাস (রা.) নিজেই বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া পরিপূর্ণ ভাবে কবুল করেছেন। তিনি বলেন, আমার বাগানে বছরে দুইবার ফল হতো আর আমার বংশধর ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনি সবমিলে আশি জনের চেয়ে বেশি ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার বয়সেও বরকত দিয়েছেন, তিনি মতান্তরে প্রায় ১০৩-১১০ বছর বয়স পেয়েছেন।

[৭]

রসূল করীম (সা.) বিভিন্ন সময়ে অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আরোগ্যের জন্য দোয়া করেছেন। খোদা তা'লা সেই দোয়া গুলো তৎক্ষণাৎ কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দিয়েছেন। সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমি কাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যার হাতে বিজয় লাভ হবে। এরপর কাকে পতাকা দেয়া হবে তার জন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে প্রত্যেকেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়তো তাকে পতাকা দেয়া হবে। কিন্তু নবী করীম (সা.) বললেন, আলী কোথায়? তাকে জানানো হলো যে তিনি চোখের

রোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলী (রা.)-কে ডেকে আনতে বললেন, তাকে ডেকে আনা হল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের মুখের লালা তার উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে তার কোন অসুখই ছিল না। তখন আলী (রা.) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষন না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের করণীয় সম্বন্ধে তাদের অবহিত কর। আল্লাহ্‌র কসম যদি একটি লোকও তোমার দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চাইতেও শ্রেয়। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নম্বর ২৭৪০)

[৮]

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার নিকটবর্তী একস্থানে শুয়েছিলেন, এরপর জেগে উঠে মুচকি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন, আমার উম্মতের এমন কিছু লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হলো যারা এই নীল সমুদ্রে আরোহণ করছে, যেমন বাদশাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করে। উম্মে হারাম (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনি (সা.) তার জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় বার নিদ্রা গেলেন এবং আগের মত আচরণ করলেন। উম্মে হারাম (রা.) আগের মতই বললেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) আগের মতই জবাব দিলেন। উম্মে হারাম (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথম সমুদ্র পথে অভিযানে বের হয়, তখন তিনি তাঁর স্বামী উবাদা ইবনে সামিতের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাদের কাফেলা সিরিয়ায় থামে। আরোহণের জন্য উম্মে হারামকে একটি সওয়ারী দেয়া হলো। তিনি সওয়ারীর উপর থেকে পরে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নম্বর ২৬০৬)

মোট কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লা রসূল করীম (সা.)-কে দোয়া কবুলিয়্যাতের সব ধরণের নিদর্শন দেখিয়েছেন। রসূল করীম (সা.)-এর দোয়া মানুষের কল্যাণে এত বেশি কবুল হয়েছে যে, এর দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা কোন্ ভাষায় সেই খোদা তা'লার শুকরিয়া আদায় করব যিনি এমন একজন মহান নবীকে মানার সৌভাগ্য আমাদেরকে দিয়েছেন!

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উভয় জগতের ইমাম ও প্রদীপ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আকাশ ও পৃথিবী আলোকিতকারী। আমি খোদা তা'লার ভয়ে তাঁকে খোদা তো বলতে পারি না, কিন্তু খোদার কসম, তাঁর সত্তা মর্তবাসীর জন্য খোদা-দর্শনের দর্পণ।"

(কিতাবুল বারিয়্যাহ্‌,
পৃ. ১৫৫-১৫৭, পাদটীকা)

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), Khalifatul Masih The V

শিক্ষক মণ্ডলী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
Teachers, Jamia Ahmadiyya Bangladesh

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস

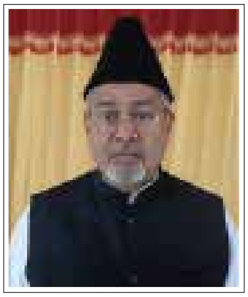

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল

মাওলানা বশিরুর রহমান
ভাইস প্রিন্সিপাল-১

মাওলানা ইয়াছিন আহমদ
ভাইস প্রিন্সিপাল-২

মাওলানা সালেহ আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক ও সম্পাদক 'নুরুদ্দীন'

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক ও হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট

মাওলানা রশিদ আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মোবারিজ আহমদ
শিক্ষক

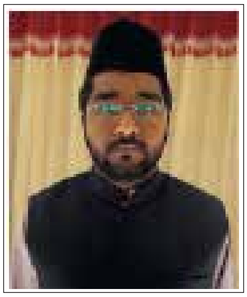

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক

মাওলানা মোহাম্মদ আল হক
শিক্ষক

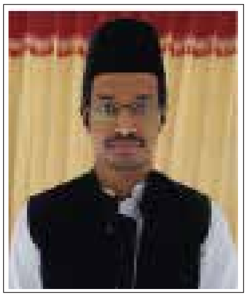

মাওলানা নাভিদুর রহমান
শিক্ষক

অধ্যাপক ফয়েজ উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সাথে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

লন্ডন বাংলাডেস্কে নিযুক্ত মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবের সাথে প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

২০১৫ সালে বাংলাদেশের সালানা জলসায় আগত হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মাওলানা মোহাম্মদ হামীদ কাউসার সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ

২০১৬ সালে বাংলাদেশের ন্যাশনাল শুরায় আগত হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মুফতি সিলসিলাহ্ মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহ্লুন সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ

২০১৬ সালে বাংলাদেশের সালানা জলসায় আগত হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মাওলানা শামসাদ আহমদ নাসের সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক মণ্ডলী সবাই একসাথে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নসীহত করছেন হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা শামসাদ আহমদ নাসের সাহেব

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৩য় শাহেদ ব্যাচের সনদ বিতরনী অনুষ্ঠান

২০১৬ সালে আগত হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা শামসাদ আহমদ নাসের সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪র্থ শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দ। বর্তমানে তারা ফিল্ডে কর্মরত

জামেয়ার লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ

জামেয়ার হলরুমে বসে এম টি এ দেখছে জামেয়ার ছাত্রবৃন্দ

রসূল অবমাননার শাস্তি

মাওলানা নাভিদুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি (যারিয়াত-৫৭)। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁর ইবাদত করা বর্ণনা করেছেন। এ লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি নবুয়তের ধারা সূচনা করেন। যেন মানুষ তাঁর উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত হয়। সে সাথে নবীগণের ওপর ঈমান আনয়ন করা এবং তাদের সাহায্য করাও মানুষের জন্য আবশ্যক করেছেন। একইসাথে তাদের অস্বীকার এবং বিরোধীতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ আখ্যায়িত করেছেন। নবীদের মাধ্যমে ধর্মের প্রবর্তন ঘটেছিল পৃথিবীকে খোদামুখী করার জন্য। কিন্তু যখন ধর্মগুলোর মাঝে বিকৃতি ঘটে এবং কালের পরিক্রমায় এর অনুসারীরাই এর সঠিক শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে তখন ধর্মগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকে সে ধর্মের পথভ্রষ্ট গুরুদের দল যারা তাদের ধর্মনেতাদের নামে অত্যাচারের বাজার গরম করে। ইসলামও এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান যুগে আমরা এসব দৃশ্যই দেখছি। তবে আমাদের জন্য আশার বিষয় আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক যুগ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত করে গেছেন এবং এসব বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য কুরআন করীমের মতো ধর্মগ্রন্থ আমাদের জন্য রেখে গেছেন যা তাঁর (সা.) তিরোধানের পনের'শ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের পথনির্দেশনার জন্য বর্তমান রয়েছে।

নৈতিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে যা ঘটে; ধর্মের মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে ধর্মকে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ যুগে মুসলমান 'আলেম'দের ক্ষেত্রেও আমরা সেটাই দেখছি। নিজের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে তারা ধর্মকে নিজ স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহার করছে এবং এজন্য এমনসব মতবাদ তারা তৈরি করেছে যার সাথে পবিত্র কুরআন অথবা নবী করীম (সা.) এর কোন সম্পর্কই নেই। তেমনই একটি তত্ত্ব হলো 'রসূল অবমাননা'। অর্থাৎ সেই মহান নবী যার জীবদ্দশাতেই অগণিত প্রেমিক নিজেদের সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালোবেসেছেন এবং আজো তাঁর অগণিত প্রেমিক রয়েছেন যারা তাদের সর্বস্ব এই মহান নবীর মর্যাদা রক্ষার্থে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত; সেই নবীকে অবমাননা করার জন্য এ যুগের কতিপয় 'ইসলামী চিন্তাবিদ' পার্থিব শাস্তির প্রস্তাব করছেন। বাহ্যত এমন দাবী রসূলের প্রেমে নিবেদিত বলে মনে হলেও তা কতটা কুরআন সম্মত?

কুরআন শরীফে নবীদের জীবনের ঘটনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে স্পষ্ট দেখা যায় আদিকাল থেকেই যখনই কোন নবী প্রেরিত হয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তাদেরকে অস্বীকার করেছে। শুধু অস্বীকারই নয় বরং নবীদের কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন পন্থা তারা অবলম্বন করেছে। যেমন–

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ

এরপর আমরা একের পর এক আমাদের রসূল পাঠিয়েছিলাম। কোন জাতির কাছে যখনই তাদের রসূল আসতো তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতো। (আল মু'মিনূন: ২৩)

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রসূলই এসেছিল তারাও এমনটিই বলেছিল, 'এ এক যাদুকর বা পাগল'। (আয্ যারিয়াত : ৫৩)

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

আর তাদের কাছে এমন কোন নবী আসে নি যার সাথে তারা হাসি-বিদ্রুপ করে নি। (আয্ যুখরুফ : ৪৩)

এসব আয়াতগুলোর নূন্যতম পাঠেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবীগণের সাথে অস্বীকারকারীদের আচরণ কেমন ছিল। যখনই কোন নবী আগমন করেছেন তাদের অস্বীকার করা হয়েছে, হাসি-বিদ্রুপ করা হয়েছে, এমনকি তাদেরকে উন্মাদ এবং জাদুকর আখ্যা দেয়া হয়েছে। এমনকি মানবজাতির এহেন আচরণে আল্লাহ আফসোস করে বলেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

হায়, আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসি-বিদ্রুপ করে। (ইয়াসিন : ৩১) উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো কি রসূল অবমাননার মাঝে পড়ে না? এর বিপরীতে নবীদের আচরণ কেমন ছিল? কুরআন শরীফ বলে,

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

'আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে হাসি-বিদ্রুপ করা হয়েছে। অতএব যারা এসব (রসূলের) সাথে হাসি-বিদ্রুপ করতো সেইসব বিষয়ই তাদের ঘিরে ফেললো যা নিয়ে তারা হাসি-বিদ্রুপ করতো।' (আল্ আম্বিয়া : ৪২)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

'আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। পরিশেষে তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে গেল।' (আল আনআম : ৩৫)

স্বয়ং রসূল করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'লা আদেশ দিচ্ছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

তুমি মার্জনার পথ অবলম্বন কর এবং সঙ্গত কাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞ লোকদের এড়িয়ে চল। (আল আ'রাফ, ২০০)

تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

'আর তুমি কাফেরদের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করো না এবং তাদের দেয়া দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে চল আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর। কেননা কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।' (আল আহ্‌যাব : ৪৯)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'লা রসূল অবমাননাকারী এবং অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কোন পার্থিব শাস্তির আদেশ দেন নি বরং এড়িয়ে চলতে এবং ক্ষমা করতে ও আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করতে বলেছেন। বরং আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অবমাননার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কুরআন করীম বলে,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

আর তিনি তোমাদের জন্য এ কিতাবে অবশ্যই এ বিধান অবতীর্ণ করে দিয়েছেন যে, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে এবং এর প্রতি বিদ্রুপ করতে শুন, তখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ বিদ্রুপকারীদের) সাথে বসো না, এমনকি তারা অন্য কথায় মগ্ন হয়ে গেলেও (বসবে) না।

অর্থাৎ তাদেরকে এড়িয়ে চল। কিন্তু এখানেও কোন পার্থিব শাস্তির উল্লেখ নেই। বরং রসূল অবমাননাকারীদের শাস্তির দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহকালেও এবং পরকালেও তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (আল আহযাব : ৫৮)

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ এই শাস্তির দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন এরপরও কথা বলা কি 'খোদার ওপর খোদকারী নয়?' তবে তথাকথিত আলেম সমাজ কোথা থেকে এর অস্তিত্ব খুঁজে পান? এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী যে আয়াতটিকে উপস্থাপন করা হয় তা হলো,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের সমুচিত শাস্তি হলো নৃশংসভাবে তাদেরকে হত্যা করা বা ক্রুশে দিয়ে মারা অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা কিংবা তাদের নির্বাসিত করা। (আল মায়েদা : ৩৪)

এ আয়াতটি সামান্য মনোযোগ দিয়ে পড়লেও বোঝা যায় যে, এতে রসূল অবমাননাকারীদের নয় বরং যারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের কথা বলা হয়েছে।

সীরাতুন্নবী (সা.) এর অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বলতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীন এর সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রহমত প্রত্যেকের জন্য বিস্তৃত ছিল। এতে শত্রু ও বন্ধুর মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁকে কষ্ট দানকারীরা তাঁর (সা.) রহমতের ছায়ায় কখনো শাস্তি পায়নি বরং ক্ষেত্রবিশেষে পুরস্কার পেয়েছে। তাঁর (সা.) সাথে অভদ্র ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী, গালমন্দকারী, ধুলা ও পাথর নিক্ষেপকারী, হাসি-বিদ্রুপকারী, গলায় চাদর জড়িয়ে টানা

হেঁচড়াকারী, বিষপ্রয়োগকারী, প্রকাশ্যে অস্বীকারকারী, ঘর থেকে বিতাড়নকারী, বারবার হত্যার চেষ্টাকারী; এসব অবমাননাকারী পৌত্তলিক, ইহুদী ও কাফেররা ছিল এবং মুসলমান মুনাফেকও। অবমাননার এমনই একটি ঘটনা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে;

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

তারা বলে, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অবশ্যই সেখান থেকে বের করে দিবে'। (আল্ মুনাফেকুন : ৯)

এটা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ছিলো যে নিজেকে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ) আখ্যায়িত করছিল। এটা কি 'রসূল অবমাননা' ছিল না? কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যবহার তার সাথে কী ছিল? তিনি তাকে কোন শাস্তি দেননি এমনকি আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্র তাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তার অনুমতি দেননি। এই মুনাফেক মৃত্যুবরণ করলে তার কাফনের কাপড় হিসেবে হুযুর (সা.) স্বয়ং নিজের চাদর তার কাফনের কাপড় হিসেবে দান করেন এবং তার জানাযাও পড়ান। নিজের অবমাননাকারীদের সাথে এমন ব্যবহার যেখানে তাঁর (সা.) রহমতের বহিঃপ্রকাশ ছিল তেমনি সেসব কুরআনী নির্দেশাবলীর ওপর আমলও ছিল যেখানে আল্লাহ তা'লা তাঁকে ক্ষমা ও করুণার আদেশ দিয়েছিলেন। অপরদিকে এটা উম্মতে মুসলেমার জন্যও এমন অবমাননাকারীদের সাথে আচরণের দিকনির্দেশনা ছিল; কেননা তাঁকে সম্বোধন করে অবতীর্ণ আদেশ মুমিনদের ওপরও বর্তায়।

এখানে এসে রসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলে ধরা হয়। এবং এমনসব রেওয়ায়েত উপস্থাপন করা হয় যেন রসূলুল্লাহ (সা.) কতিপয় ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করেছেন যে, তারা তাঁর (সা.) অবমাননা করতো। অথবা কিছু সাহাবী স্বয়ং তাঁর অনুমতিতে এমন অবমাননাকারীদের হত্যা করেছেন। কিন্তু দেখার বিষয় হলো রসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র জীবনীতে কি এমন বৈপরিত্য সম্ভব যে, একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অবমাননাকারীকে তো তিনি ক্ষমা করে দিলেন অথচ কতিপয় ব্যক্তিকে শাস্তি দিলেন? সম্পূর্ণ ঘটনাকে সকল দিক থেকে বিশ্লেষণ না করে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এমনসব শাস্তির ঘটনায় মহানবী (সা.) এর কঠোর আচরণের কারণ তাঁর অবমাননা ছিল না বরং অন্য কিছু অপরাধ ছিল যা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা অথবা মুসলমানদের সামগ্রিক মর্যাদাকে বিনষ্ট করে। যেমন, মক্কা বিজয়ের ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয় যে, মহানবী (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরও কতিপয় ব্যক্তিকে 'রসূল অবমাননার' কারণে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এমনকি তারা যদি কা'বার গিলাফের নিচে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ যাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা আরো নানাবিধ অপরাধে জড়িত ছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করা প্রভৃতি। যদি 'রসূল অবমাননা'-ই কারণ হয়ে থাকে তবে এতে সমগ্র মক্কা দোষী ছিল। এছাড়া এদের মধ্যেই কতিপয় ব্যক্তিকে হুযুর (সা.) ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

এরপর 'কাব বিন আশরাফ' এর হত্যার ঘটনাটিকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। অথচ এখানেও একই ব্যাপার ছিল। সে মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে উত্তেজিত করছিল। মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর জন্য আবশ্যক ছিল এমন ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্র প্রধানের অবশ্য কর্তব্য। মহানবী (সা.) সেটাই করেছেন।

সর্বোপরি এক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত আমাদের জন্য পাথেয়। তিনি বলেন, হুযুর (সা.) কখনো নিজের সত্তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কৃত কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নেননি। (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

কুরআন ও সুন্নতের এসব উদ্ধৃতির আলোকে এ বিষয়ে মহানবী (সা.) এর আদর্শ এবং শিক্ষা কী ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একজন ন্যায়পরায়ন ব্যক্তির জন্য এসব যুক্তি-প্রমাণ যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

আল্লাহ তা'লা মুসলিম উম্মাহ'কে সুমতি দিন তারা যেন মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসার দাবীতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণে এমন সব কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হয় যা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর অবমাননার কারণ।

ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য কুরআন এবং মহানবী (সা.) এর সুন্নতের বিধানই যথেষ্ট। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরে মুসলমানদের জন্য কোন নতুন আইন প্রণয়নের অধিকার নবী করীম (সা.) কাউকে দেননি।

দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

সাব্বির আহমদ
ছাত্র [৬ষ্ঠ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) শৈশব থেকেই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনাকারী খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে দিন রাত ভাবতেন, নীরবে-নিভৃতে তাঁর সন্ধান করতেন, তাঁর নৈকট্য পাবার আকাঙ্খা রাখতেন। অবশেষে চিরঞ্জীব খোদা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে ধরা দিলেন। শুধু এতটুকুই নয় বরং খোদা তা'লা চাইলেন যে, তাঁর (সা.) মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য সকল মানুষও যেন খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হয়। তাই আল্লাহ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য দাঈ ইলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

অর্থাৎ হে রসূল (সা.)! তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি এর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না। (সূরা মায়েদা : ৬৮)

এই আদেশের অনুসরণে রসূলুল্লাহ (সা.) খোদা তা'লার দিকে আহ্বানকারী এক মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন। তিনি (সা.) সারা জীবন গোপনেও তবলীগ করেছেন, প্রকাশ্যেও তবলীগ করেছেন, দিনের আলোতে আবার রাতের আঁধারেও মানুষকে খোদার দিকে আহ্বান করেছেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল সকলকে ইসলামের সংবাদ পৌছিয়েছেন। তিনি (সা.) কখনও শক্তিশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে তবলীগ করতে ভয় পেতেন না বরং সর্বদা হিকমত ও ধৈর্য্যের সহিত তাদের সাথে কথা বলতেন। তিনি (সা.) বলেছেন,"আমি তো শুধুমাত্র একজন মুবাল্লেগ (তবলীগকারী) হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। হেদায়াত তো আল্লাহ-ই দিয়ে থাকেন। (আহমদ বিন হাম্বল)

আঁ-হযরত (সা.)-এর হৃদয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কিরূপ ব্যাকুলতা ছিল তা একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়। একবার তিনি (সা.) বলেন, আমার এবং তোমাদের অবস্থা সেই দৃষ্টান্তের ন্যায় যে, কোন ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়েছে আর উইপোকা ও পোকামাকড় এর উপর এসে পড়তে চায়। সেই ব্যক্তি যখন এই পোকা-মাকড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়, তারা দূরে সরে না বরং আগুনে পতিত হয়। তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে কোমরে টেনে ধরে আগুন থেকে বাঁচাতে চাই কিন্তু তোমরা উন্মাদের ন্যায় আগুনের দিকে অগ্রসর হও। (বুখারি)

তবলীগ করার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সা.) সব ধরনের উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। সর্বদা কোমল ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি (সা.) সুসংবাদ দানের মাধ্যমেও আবার খোদা তা'লার আযাবের ভয় দেখিয়েও ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু সর্বদা বিনয় ও নম্রতার আচরণ প্রদর্শন করতেন। দাওয়াত ইলাল্লাহর বিনিময়ে তিনি সারাজীবন চরম দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-নির্যাতন ও বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদা ধৈর্য্য ধরেছেন এবং এ কাজে কখনও পিছপা হন নি। আঁ-হযরত (সা.) এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি হিকমত ছিল, তিনি তবলীগ করার পূর্বে খোদার কাছে দোয়া করতেন ও সাহায্য চাইতেন। আবার সংবাদ পৌছানোর পরও তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করতেন।

আঁ-হযরত (সা.) এর সমস্ত জীবনের দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কর্মকান্ডকে কয়েকটি প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা যেতে পারে :

প্রাথমিক পর্যায়ে তবলীগ

আঁ-হযরত (সা.) নবুয়ত লাভের পর থেকে তিন বছর পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে গোপনে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষদেরকে তবলীগ করেছেন। ফলশ্রুতিতে সেই সময় হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আবার তাদের কাছের মানুষদেরকে তবলীগ করেছেন। এতে করে হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা), হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ (রা.)ও ঈমান এনেছিলেন। এই সময় তবলীগের মূল হাতিয়ার ছিল আচরনের উত্তম নমুণা প্রর্দশন। উপরোক্ত সাহাবীদের অধিকাংশই রসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তম আচরণ, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কারণে ঈমান এনেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন রসূলুল্লাহ (সা.) এর দাবীর কথা শুনলেন তখন সোজা তাঁর (সা.) কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,

আপনি কি নবুয়তের দাবী করেছেন? রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য বিস্তারিতভাবে বলতে চাইলেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) শুনতে চাইলেন না বরং কসম দিয়ে বললেন, "আপনি শুধু দাবি করেছেন কি না তা বলুন, আর কিছু শুনতে চাই না। এরপর রসূলুল্লাহ (সা.) হ্যাঁ সূচক জবাব দিলে আবু বকর (রা.) সাথে সাথে তার উপর ঈমান আনলেন।

নিকটাত্মীয়দের কাছে তবলীগ

নবুওয়তের তিন বছর অতিক্রান্ত হবার পর আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.) কে নিকট-আত্মীয়স্বজনদের কাছে তবলীগ করার আদেশ দিয়ে বলেন-

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থাৎ "এবং তুমি সর্বপ্রথম নিজের নিকট-অত্মীয়স্বজনদেরকে সতর্ক কর" (সূরা শুআরা : ২১৫)। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) একদিন খুব সকালে মক্কার সাফা পাহাড়ে উঠে আহ্বান করতে লাগলেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! হে আবদে মুনাফের বংশধর! হে কাসসীর বংশধর! এছাড়া অন্যান্য ছোট ছোট কাবিলাকেও আহ্বান করলেন। এই আহ্বান শুনে আশে পাশের সবাই পাহাড়ের নিচে একত্রিত হল। অতঃপর তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, পাহাড়ের ঐ পাশে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, 'কেন নয়, আমরা অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করব। কেননা আজ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা হল, তুমি সত্যবাদী এবং কখনও মিথ্যা বল নি'। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে এক খোদার দিকে আহ্বান করলেন। এটি শুনে আবু লাহাব ও অন্য সবাই গালিগালাজ করতে করতে উঠে চলে গেল। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, যখন খোদার পক্ষ থেকে নিকটাত্মীয়দেরকে তবলীগ করার আদেশ হল তখন মুহাম্মদ (সা.) বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমি যখন তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে যাব তখন তারা অস্বীকার করবে। কিছু সময় তো আমি চুপ ছিলাম কিন্তু জীবরাঈল (আ.) এখন এসে আমাকে বলল, 'যদি আপনি আপনার খোদার আদেশ পালন না করেন, তাহলে তিনি আপনাকে পাকড়াও করবেন'। এটি শুনে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা)-কে বলে দুই দুইবার ভোজের আয়োজন করলেন এবং বনু মুত্তালিবের বংশের সকলকে এর মাধ্যমে ইসলামের সংবাদ পৌছালেন।

দারে আরকাম ও প্রকাশ্যে তবলীগের সূচনা

হযরত আরকাম বিন আরকাম (রা.) ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে এগারতম সাহাবী ছিলেন। তার ঘর সাফা পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের তবলীগের একটি ঘাঁটি প্রয়োজন ছিল। তাই হযরত আরকাম (রা.) এই উদ্দেশ্যে তার ঘরটি দিয়ে দিলেন। দারে আরকাম থেকে রসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাথীরা গোপনে কুরাইশদের মধ্যে তবলীগ করতেন। এভাবে কিছু যুবক ও দূর্বল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তখন তবলীগের সময় হিকমতের সাথে এক আল্লাহর ইবাদত ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহারের কথা বলতেন বিধায় কুরাইশ নেতারা বড় ধরণের কোন বিরোধিতা করেনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) যখন তৌহীদের প্রচারের পাশাপাশি মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করতে লাগলেন এবং তাদের উপাস্যদের ত্রুটি ও দূর্বলতা বর্ণনা করতে লাগলেন, এছাড়া যখন হযরত উমর (রা.) যিনি অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন এবং ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন মক্কার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে একজোটে বিরোধিতা শুরু হলো। কিন্তু উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মক্কায় ও মক্কার বাইরে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু হয়েছিল।

ইসলামের তবলীগে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আপোষহীনতা

আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রকাশ্য তবলীগের প্রভাব দেখতে পেয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলল, আপনার ভাতিজা আমাদের ধর্মকে নষ্ট করে দিচ্ছে। হয় আপনি তাকে এসব থেকে বিরত রাখুন নতুবা আপনি তাকে ছেড়ে দিন, যেন আমরাই এর ফয়সালা করতে পারি। সেদিন আবু তালিব তাদের সাথে কোমলতার সাথে কথা বলে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) কোন ভাবেই তার দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ থেকে বিরত হচ্ছিলেন না আর দিন দিন উন্নতি করে যাচ্ছিলেন বলে তারা আবার আবু তালিবের কাছে এলো এবং বলল, "আপনি আমাদের নেতা আপনার খাতিরে এতদিন আমরা আপনার ভাতিজাকে কিছু বলিনি। কিন্তু, আর তো চুপ করে থাকা যায় না। এখন আপনার সাথে আমাদের একটি বোঝাপড়া হওয়া উচিৎ। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, আসলে সে আমাদের কাছে কি চায়? যদি তাঁর ইচ্ছা এটিই হয় যে, সে সম্মান চায় তাহলে আমরা তাকে আমাদের নেতা বানাতে রাজি আছি। যদি সে ধন-সম্পদ চায়, তাহলে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাকে দিতে রাজি আছি। যদি সে বিয়ে করতে চায়, তাহলে মক্কার যে কোন যুবতীর নাম সে বলুক, তার সাথে আমরা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দিচ্ছি। এসব কিছুর পরিবর্তে আমরা তাঁর কাছে কিছুই চাই না, শুধু এতটুকুই চাই যে, সে যেন আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে। আপনি তাকে বুঝান এবং আমাদের প্রস্তাব মেনে নিন। তা না হলে দুটোর একটা আপনাকে করতেই হবে- হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে ছাড়বেন, নয়তো আপনার জাতি আপনাকে পরিত্যাগ করবে"। কথাগুলো আবু তালিবের জন্য ছিল অত্যন্ত

কঠোর ও মর্মান্তিক। কেননা আরবের লোকদের জন্য নেতৃত্ব অনেক প্রিয় ছিল। অতএব, তিনি যখন রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ডেকে তাদের কথাগুলো বললেন তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। তার চোখে পানি দেখে রসূলুল্লাহ (সা.)ও অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, কিন্তু তিনি (সা.) তো তাঁর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন না। তাই তিনি (সা.) বললেন, "চাচাজান, আমি একথা বলছি না যে, আপনি আপনার জাতিকে ছেড়ে দিন এবং আমার সাথেই থাকুন। আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে ছাড়তে পারেন। কিন্তু আমি এক আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চন্দ্রকে আমার বামে এনে খাড়া করে দেওয়া হয়, তাহলেও আমি আমার খোদার একত্বের বাণী প্রচার থেকে বিরত হতে পারব না। আমি আমার কাজ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত করে যেতেই থাকব। আপনি আপনার অবস্থান নিজেই ঠিক করে নিন"।

শে'বে আবি তালিবে তবলীগ

মক্কার কাফেররা যখন দেখল, রসূলুল্লাহ (সা.)-কে কিছুতেও তবলীগ থেকে বিরত রাখা যাচ্ছিল না তখন তারা পরামর্শ করে মুসলমানদের শে'বে আবি তালিব নামক স্থানে প্রায় তিন বছর বয়কট করে রেখেছিল। এই সময়ে তারা মুসলমানদের সাথে কথা বলা, ক্রয়-বিক্রয় সব ধরণের সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছিল। এই তিন বছর মুসলমানরা বর্ণনাতীত কষ্ট করেছিলেন, কিন্তু দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখনও সুযোগ পেলে তবলীগ করতেন। সেই সময় যে সমস্ত ব্যবসায়ী কাফেলা মক্কায় আসত, রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাথে লেন-দেন করার সুযোগে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

তায়েফ সফর

তিন বছর পর মক্কার কিছু ন্যায়বিচারক ও সহানুভূতিশীল নেতৃবৃন্দের কারণে মুসলমানদেরকে শে'বে আবি তালিবের বয়কট থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অবিরাম বিরোধিতা চলছিল। প্রথমত: তারা মহানবী (সা.)-কে রাস্তায় চলাফেরা করতে দিত না। যখনই তিনি (সা.) বাইরে আসতেন তাঁর মাথায় ধূলাবালি, ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত, গালিগালাজ করা হত। অথচ মহানবী (সা.) এ ধরনের দুঃখ-কষ্টকে নিত্যসঙ্গী বলে মেনে নিতেন। দ্বিতীয়ত: মক্কাবাসীরা তাঁর (সা.) কোন কথা শুনতে রাজি হতো না। এ বিষয়টি তাঁর (সা.) জন্য সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর ছিল। একদিন তিনি (সা.) তবলীগের জন্য মক্কার অলি-গলিতে ঘুরতে লাগলেন, কিন্তু কেউ তাঁর (সা.) কথা শুনল না। এতে রসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.) এর হৃদয়ের একমাত্র বাসনা ও উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে এক খোদার দিকে আহবান করা। তাই তিনি (সা.) যখন তাঁর উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পালন করতে পারলেন না, নিরাশ হয়ে বসে পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفۡسَكَ اَلَّا یَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ

অর্থাৎ তারা মুমিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে? (সূরা শুআরা : ৪)। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষে সত্যায়ন করেছেন যে, তিনি (সা.) তবলীগ করার জন্য জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত ছিলেন। যা হোক, তিনি (সা.) তো আর বসে থাকার পাত্র নন। নবুয়তের দশ বছর পর তিনি মক্কার বাইরে যেয়ে তবলীগ করতে চাইলেন। অতঃপর তিনি (সা.) মক্কা থেকে ৬০ মাইল পূর্বে তায়েফ শহরে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে গেলেন। তিনি (সা.) সেখানে যাওয়ার পর তায়েফের বড় বড় নেতৃবৃন্দ রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আসতে লাগল। তিনি সবাইকে এক খোদার দাওয়াত দিলেন, কিন্তু কেউই সত্য গ্রহণ করতে রাজি হল না বরং খোদার পয়গামের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে করতে চলে গেল। তারা যখন দেখল যে, তাঁর সাথে না আছে লোকজন, না আছে সেনাদল, না আছে অস্ত্রশস্ত্র, তাই হৃদয়ের দিক থেকে অন্ধ লোকগুলো তাঁকে মানতে পারল না। এছাড়া যেহেতু তাদের সাথে মক্কার নেতাদের ভাল সম্পর্ক ছিল তাই তারা ভাবল যে, একে দুঃখ কষ্ট দিলে আমরা মক্কার নেতাদের প্রশংসা পাব। অতএব তারা কিছু দুষ্ট ছেলেদের একত্রিত করে তাঁর (সা.) পেছনে লাগিয়ে দিল। দুষ্ট ছেলেরা ঝোলাভর্তি পাথরের টুকরা নিয়ে তাঁকে (সা.) ঢিল ছুড়তে ছুড়তে এমনভাবে রক্তাক্ত করে দিল যে, তাঁর (সা.) পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে আঠা লেগে গিয়েছিল যা সহজে খোলা সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট দিতে দিতে তাঁরা আঁ-হযরত (সা.) কে তায়েফ থেকে বিতাড়িত করল। এত কিছুর পরও তিনি (সা.) এই ভয় পাচ্ছিলেন যে, না জানি খোদার গযব তাদের উপর এসে পড়ে। তাই তিনি তাদের জন্য খোদার কাছে দোয়া করলেন, কেননা তাঁর (সা.) মনে এই আশা ছিল যে, তারা একদিন না একদিন অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবে।

মদীনাবাসিদেরকে তবলীগ

মহানবী (সা.) প্রতি বছর হজ্বের মৌসুমে আরবের চতুর্দিক থেকে আগত লোকদের কাছে তৌহিদের বাণী প্রচার করতেন। অনেকে তাঁর কথা শুনত, অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে চলে যেত। আবার অনেক সময় মক্কাবাসিরা তাদেরকে তাঁর (সা.) কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিত। এমনিভাবে একদিন তিনি যখন মীনা উপত্যকায় পায়চারী করছিলেন, তখন মদীনার ছয়-সাত জন লোকের প্রতি তাঁর (সা.) দৃষ্টি পড়ল। তিনি তাদের কাছে যেয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কথায় প্রভাবিত হয়ে ঈমান আনল। অতঃপর তারা মদীনায় ফিরে গিয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌছাতে লাগল। তাদের কথা শুনে মদীনার আরো অনেকে ঈমান আনল।

হিজরতের সময় তবলীগ

হিজরতের সফর সর্বদা বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আর রসূল করীম (সা.)-এর হিজরতের সফর কতটা ভয়ংকর ছিল তা আমরা সকলেই অবগত। মদীনার বুরিদাহ্ নামী এক আনসার নিজ গোত্র বনী সাহেমের সত্তর আরোহী নিয়ে সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হিজরতের পথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। এমন বিপদের সময়েও রসূলুল্লাহ (সা.) সেই গোত্রের সাথে পরিচিত হলেন এবং তাদেরকে এক খোদার সংবাদ পৌঁছালেন। বুরিদাহ্র সাথে আঁ-হযরত (সা.) এমন হিকমতপূর্ণ ও মিষ্টভাষায় কথা বলেন যে, তিনি তার সম্পূর্ণ গোত্র নিয়ে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন। (ইবনুল জাওযী)

মদীনায় তবলীগ

মদীনায় যাওয়ার পর আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর সাথীগণ ইহুদী খ্রিষ্টানদের কাছে জোরেশোরে তবলীগ করা শুরু করেন। তিনি (সা.) দিন রাত এই কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। তবলীগের কোন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করতেন না। একবার রসূলুল্লাহ (সা.) গাঁধায় চড়ে মদীনার সর্দার সা'দ বিন উবাদাহ কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক মজলিসে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল ও অন্যান্য মুশরিক, মূর্তিপূজারী ও কিছু মুসলমানও ছিল। তাঁর (সা.) সওয়ারীর কারণে তাদের উপর ধূলা উড়তে শুরু করলে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিরক্ত হল আর মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে বলতে লাগল, আমাদের উপর ধূলা উড়িও না। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) তাদের কাছে গিয়ে সালাম দিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন আর কুরআন করীমের কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন। (বুখারি)

বহিঃদেশের রাজা বাদশাহ্দের কাছে তবলীগ

মদীনায় যাওয়ার পরও মক্কার কাফেররা মুসলমানদের পিছু ছাড়েনি। এমনকি মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে বেশ কয়েকবার তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। অবশেষে যুদ্ধ বিগ্রহ ও সংকটের অবস্থা উত্তরণের পর মদীনার অবস্থা যখন কিছুটা শান্ত হল তখন মহানবী (সা.) আরবের প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজা-বাদশাহ্দের এক খোদার দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করতে লাগলেন। রাজা-বাদশাহ্দের এ ধরণের পত্র দেওয়া একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল। কেননা তাদেরকে নিজের আনুগত্যের জন্য সম্বোধন করে পত্র লেখা যুদ্ধের আহবানের নামান্তর। কোন সাধারন মানুষের পক্ষে এটি সম্ভব নয়। কিন্তু আ-হযরত (সা.), যিনি দাওয়াত ইলাল্লাহ্র জন্য দিওয়ানা ছিলেন, খোদা তা'লার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও নিজ দায়িত্ববোধের কারণে এই কাজ করতে বিন্দুমাত্র ভয় পাননি।

বলা বাহুল্য, রসূলুল্লাহ (সা.) কখনও তবলীগের জন্য কাউকে তুচ্ছ মনে করতেন না। তিনি যেমনটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তবলীগ করেছেন তেমনি দরিদ্র ও নিচ্ বংশের লোকদেরও তবলীগ করেছেন। দাস-দাসী কিংবা মজদুর-রাখাল কারও কাছে তবলীগ করতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। একবার এক রাখাল ছাগল চড়াচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সা.) তাকে দেখে তার কাছে গেলেন এবং নির্দ্বিধায় তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (হুলায়বিয়াহ)

অন্য একবার, তিনি (সা.) এক ইহুদী অসুস্থ যুবককে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তার মাথার পাশে বসেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। সে যুবক তার পিতার দিকে তাকাল, তার পিতা রসূলুল্লাহ (সা.) এর স্নেহ-ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দেখে পুত্রকে বললেন, 'বাবা, আবুল কাসেম (মুহাম্মদ সাঃ) যা বলে মেনে নাও'। সুতরাং সে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (বুখারি)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমনিভাবে আমৃত্যু দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করে গেছেন । তিনি তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণে জীবনের শেষ ওসীয়্যতেও দাওয়াত ইলাল্লাহর ব্যপারে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি (সা.) বলেছেন, **"এই সমস্ত কথা যা আজ আমি তোমাদের বলেছি তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিও, কেননা এমনও হতে পারে যারা আজ আমার কথা শুনছে, তাদের চাইতে যারা এখন আমার কাছে আমার কথা শুনছে না, তারা এই সকল কথার উপর বেশী আমল করবে।"**

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সা.) দাঈ ইলাল্লাহর এমন এক আদর্শ ছিলেন, পৃথিবী সৃষ্টি অবধি যার কোন তুলনা নেই। সুতরাং, আজ আমরা তাঁর উম্মত হয়ে যারা যুগ ইমামকে মেনেছি, আমাদেরও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ইলাল্লাহর উত্তম নমুনা প্রদর্শন করা, তাহলেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত উম্মত ও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারব । আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সন্তানের তালিম-তরবিয়তে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ

সংসার জীবনে হৃদয়ে সন্তানের আশা পোষণ করে না এরূপ মানুষ সম্ভবত জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন সন্তানের বাসনায় সে ব্যাকুল হয়ে যায়। ধন-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তির চূড়ান্তমার্গে উপনিত হবার পরেও তার হৃদয়ে শুধুমাত্র একটি সন্তানহীনতা সব পাওয়াকে শূন্যতায় পরিণত করে। এ শূন্যতা পূরণ করতে মানুষ জাগতিক সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে অসহায়-অনাথ ভিক্ষুকের ন্যায় সৃষ্টিকর্তার দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে দোয়া করতে থাকে- "হে আমার প্রভূ! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী ।"(সূরা আল ইমরান : ৩৯)

আল্লাহ্ যাদেরকে ঊর্ধ্বলোকের জ্ঞান দিয়েছেন তাঁরা যৌবনের দ্বারে উপনীত হয়েই আল্লাহ্‌র দরবারে কাতর হয়ে দোয়া করতে থাকেন– "হে আমাদের প্রভূ! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে নয়নের স্নিগ্ধতা দান কর আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।" (সূরা ফুরকান : ৭৫)

প্রকৃত অর্থে সংসারে সুখ-শান্তি আর সৌন্দর্যের পরিপক্কতা লাভ তখন হয়, যখন কোন দম্পতি সন্তান-সন্ততির মুখে মা-বাবা ডাক শোনার সৌভাগ্য অর্জন করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়েও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়েও উৎকৃষ্টতর।' (সূরা কাহাফ : ৪৭) নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের মহাসাফল্য নয়নের মনি, আদরের ধন, কলিজার টুকরা সন্তান-সন্ততি যেন পবিত্র চারিত্রিক গুণেগুণান্বিত হয়ে পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকামি হতে পারে তার প্রয়োজনীয় উপাদান 'তালিম-তরবিয়ত'। সন্তান-সন্ততির তালিম-তরবিয়তের লক্ষ্যে সৃষ্টিকুলের সর্ব-শ্রেষ্ঠ পিতা সৈয়্যদুল আম্বীয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাতলানো পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন পদ্ধতি নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন- 'তোমাদের সন্তান-সন্ততির মালিক তোমরা নও। তারা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের নিকট আমানত। তোমরা সবাই খোদার এ আমানতের সঠিক হেফাজত কর'। (বুখারী) হযরত উবায়দা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন- 'যে ব্যক্তি বয়ঃবৃদ্ধ লোকদিগকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা বুঝে না, সে আমার উম্মতের মাঝে গন্য নহে'। (মুসনাদ আহমদ)

হযরত রসূল করীম (সা.) স্বীয় উম্মতকে নসিহত করে বলেন- "তোমরা শিশুদেরকে মহব্বত কর, তাদের প্রতি দয়াপরবশ হও, তাদের সাথে ওয়াদা করলে তা অবশ্যই পূর্ণ কর, কেননা তারা তোমাদেরকেই রিয্‌কদাতা হিসেবে জানে" (মুসলিম)। হাবিবে খোদা, সমতা বা সাম্যের মহাপ্রতিক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বানী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন তথা সমাজের প্রতিটি মানুষের অন্তরের ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ লাভ করাটা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার হিসেবে ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজে রসূল করীম (সা.)-এর নসিহতগুলো বর্তমানকালে সিকায় তোলা বাসি খাদ্যে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। আজ-কাল সবাই নিজেকে নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পরেছে। স্বীয় গন্ডির বাইরে দৃষ্টি দেবার মত সময় বা প্রয়োজন উপলব্ধি করার মত মানুষের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চৌদ্দ শত বছর পরেও ভাগ্য তাড়িত বেশুমার শিশু ইসলামি মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তাদের জীবন বিকাশের স্বপ্ন সাধনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। বেশুমার মানব শিশু কেবল মাত্র এক মুঠো ভাতের অভাবে ক্ষুধার তাড়না নিবারন করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বৃত্তবানদের দ্বারে দ্বারে। ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে তারা হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনী খাঁটছে সমাজের বৃত্তবানদের গৃহ আর মিল-ফ্যাক্টরিতে। দিন-রাত পরিশ্রম করে খাবার হিসেবে পাচ্ছে তারা মনিব সন্তানের উচ্ছিষ্ট বা পঁচা-বাসি খাদ্য কণা। তাও আবার পান থেকে চুন খসলেই ভাগ্য বিড়ম্বনার স্বীকার অবুঝ শিশুর উপর চলছে মনিব-মনিবী বা তাদের ছেলে-মেয়েদের অবর্ণনীয় নয় শুধু! অসহনীয় নির্যাতন। নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে কত শত মানব শিশু চিরপঙ্গুত্ব বরণ বা অকালে পরপারে চলে যাচ্ছে তার হিসেব নেই কারো কাছে। প্রতি দিনের পত্র-পত্রিকায় কোমলমতি শিশু নির্যাতনের যে, ভয়ঙ্কর চিত্র ফুটে উঠছে, এর দ্বারা প্রমাণ হয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এসব মনিবদের মোকাবেলায় আইয়ামে জাহেলিয়্যাত যুগের নরপশুরূপী মনিবরাও হার মেনেছে! শিশুদের তালিম-তরবিয়তের জন্য সচেতন, সুশিক্ষিত, সুসভ্য প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। কিঞ্চিৎ সহানুভূতির ফলে খুব

সহজেই আমরা পৃথিবীটাকে শিশুদের জন্য স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করতে পারি। আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসূলই শিশুদেরকে ভালোবাসতেন, আদর করতেন, মুল্যায়ন করতেন তাদের মন মানসিকতার। শিশুর কান্নার শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশের ফলে হৃদয়ে মায়া-মমতার ঝঙ্কার সৃষ্টি হবার ফলে যিনি জুম'আর খুৎবা ও নামায সংক্ষেপ করতেন, তিনি আর কেউ নন, তিনিই আমাদের প্রিয় নবী শান্তি দূত হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, "আমি সুদীর্ঘ দশটি বছর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খেদমত করার মহাসৌভাগ্য লাভ করেছি। তিনি (সা.) কোন সময় আমাকে ধমক দিয়ে উহ্ বলে কথা বলেন নি। আমি কোন কাজ করলে তিনি কখনো আমাকে এ কথা বলেননি যে, এ কাজ কেন করলে ? আর কোন কাজ না করলেও এ কথা বলেন নি যে, এ কাজ কেন করলে না। তিনি কখনো আমাকে তিরস্কার করেন নি। অন্য কেউ আমাকে তিরস্কার করলে, তিনি বলতেন, ওকে ছেড়ে দাও, যা করার করেছে, আর যা হবার তা হবেই "। (বুখারী, মুসলিম)

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি শিশুকে ভালোবাসতেন, তাদের সাথে সহাস্য বদনে কথা বলতেন, তাদের মাথায় স্বীয় রহমতের মোবারক পূর্ণ হস্ত বুলাতেন। তাদের জন্য খোদার দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করতেন। তাদের কোলে নিতেন, চুমু দিতেন, কাঁধে নিয়ে ঘুরতেন, সালাম দিতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- "একবার এক লোক একটি শিশু নিয়ে রসূল করীম (সা.)-এর খেদমতে এসে শিশুটিকে চুমু খেতে লাগলেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে হুযূর (সা.) বললেন, শিশুটির প্রতি কি তোমার হৃদয়ে মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে? সে বলল, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সা.)। হুযূর (সা.) তাকে বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে এর চেয়ে আরো বেশী মহব্বত করবেন। কেননা তিনি সর্বাপেক্ষা দয়ালু।' (বুখারী) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একবার রসূল করীম (সা.) হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.) কে চুমু দিলেন, এ দৃশ্য দেখে হযরত আকবা ইবনে হারিস (রা.) বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি তাদেরকে কখনো চুমু দেইনি। এ কথা শুনে হুযূর (সা.) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি শিশুদের প্রতি রহম করে না, তাদের প্রতিও রহম করা হয় না।"(বুখারি, মুসলিম) কোমলমতি ছোট্ট শিশুদের তিরস্কার আর উপহাস নয় যতটা সম্ভব তাদের প্রশংসা করাই হচ্ছে সুন্নতে রসূল (সা.)। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের মানুষিক বিকাশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁর নিকট কোন অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শিশু আসলে, তিনি (সা.) বাচ্চার মাকে নসিহত করতেন। "তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের প্রত্যহ গোসল করাবে, তাদের জামা কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, নাক সাফ করে দিবে। প্রত্যহ দাঁত ব্রাশ করাবে, কানে খৈল জমতে দিবে না, বিছানায় শায়িত অবস্থায় বাচ্চাকে স্তন পান করাবে না। সপ্তাহে একবার বাচ্চার নখ কাটবে, মাথার চুল ছোট করে রাখবে, তাকে কখনো ঠান্ডা দুধ আর বাসি খাবার খাওয়াবে না। কোন ক্রমেই বাচ্চাকে খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করতে দিবে না আর তাদের কখনো উলঙ্গ রাখবে না। প্রত্যহ ভোরে ঘুম থেকে জেগে অযু-গোসল সেরে নামায আদায় এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে, এ সময় বাচ্চাকে সাথে রাখবে। বাচ্চাদের জন্য খেলাধূলা ও মার্জিত বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিবে, এর ফলে তাদের মন ও স্বাস্থ্য সতেজ থাকবে"।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর চাচাত ভাইদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিজে দূরে দাঁড়িয়ে বলতেন যে, 'তোমাদের মাঝ থেকে দৌড়ে এসে যে আমাকে প্রথমে স্পর্শ করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে'। প্রতিযোগিদের মাঝে যিনি প্রথমে আসতেন, হুযূর (সা.) দুই হাত সামনে প্রসারিত করে তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে নিয়ে আদর করতেন এবং সবাইকে একটা কিছু উপহার দিতেন"। (বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত) ইসলামের মৌলিক স্লোগান হচ্ছে, "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে"। মানুষ মানুষের জন্য, যে মানুষ মানুষের কোন কল্যাণে আসে না, সে আসলে মানুষ নয়। মানুষ আহত হবে, আঘাত পেয়ে মৃত্যু যন্ত্রনায় কাতরাবে, আর কেউ দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে বা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, এটা কোন সভ্য জাতির কাম্য হতে পারে না। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.) বলেন, উসামা একবার আমার দরজার চৌকাঠের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে মুখে আঘাত পায়। হযরত রসূল করীম (সা.) আমাকে তার মুখের রক্ত পরিস্কার করতে বলেন, এতে আমি সংকোচ বোধ করি। এমতাবস্থায় হুযূর পাক (সা.) নিজে তার মুখের রক্ত মুছে পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনি (সা.) বললেন, উসামা যদি বালিকা হতো তবে আমি তাকে সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ, গহনা পরিয়ে দিতাম এবং নিজে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতাম"। হযরত আয়শা (রা.) আরো বলেন যে, 'একবার হুযূর (সা.) নিজে উসামার নাক পরিষ্কার করতে অগ্রসর হলে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি থামুন আমি পরিষ্কার করছি। আমার কথা শোনে তিনি বললেন, হে আয়েশা! তাকে মহব্বত করবে। কেননা আমি তাকে মহব্বত করি।" (বুখারি, মুসলিম) ছোট্ট সোনামনিদের খেলার সাথী অনাথ আর অসহায় বাচ্চাদের সর্ব্বোত্তম অবিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "কোন পিতা যখন তার সন্তানের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন তার আমলনামায় একটি গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়।" সন্তানের প্রতি প্রত্যেক পিতার অন্তরে মহব্বত বিদ্যমান রয়েছে, তবে অন্তরের সেই মহব্বতের বহির্প্রকাশ একেক জনের একেক রকম। পবিত্র কুরআন করীমে আমাদের অনুকরণ-অনুসরণের নিমিত্তে একজন মহান পিতার দৃষ্টান্ত পেশ করতে যেয়ে বলা হয়েছে- "এবং সে (ইয়াকুব) বলল, আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবং সে ছিল অসহনীয় মনঃস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা (ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা) বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা ভুলবেন না।

যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষ হবেন অথবা মারা যাবেন।" (সূরা ইউসুফ : ৮৫-৮৬) আমাদের আঁকা ও মাওলা দো'জাহানের বাদশাহ্ সিরাজামমুনিরা, নূরুন আলা নূর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ে সন্তানের প্রতি বিদ্যমান মহব্বত সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হুযূর পাক (সা.) তাঁর পুত্র হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে মদিনা মনোয়ারা শহরের বাইরে উচ্চ বংশে দুধ পান ও লালন-পালনের জন্য দেয়া হয়েছিল। হুযূর (সা.) সেখানে হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে দেখতে যেতেন, আমরাও তাঁর সাথে যেতাম । হুযূর পাক (সা.) হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে কোলে নিয়ে চুমু খেতেন, দীর্ঘ সময় আদর করতেন, এরপর ফিরে আসতেন।" হযরত ইব্রাহিমের (আ.) ওফাতের পর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চক্ষু মোবারক গড়িয়ে পানি পড়তে লাগল। এ দৃশ্য দেখে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) বিনীতভাবে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সা.)! এ কী? হুযূর পাক (সা.) উত্তর দিলেন, এটা হচ্ছে, সন্তানের প্রতি পিতার হৃদয়ে রহমান আল্লাহ্র ঢেলে দেয়া রহমত বারী। আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় বান্দার মাঝে যাকে ইচ্ছা, তার হৃদয়ে এ মহব্বত ঢেলে দেন।" (বুখারী)

সাহাবিগণ (রা.) স্বীয় শিশুদের নাম করণ ও দোয়ার জন্য হযরত নবী করীম (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসতেন। এ সময় নবী করীম (সা.) শিশুদেরকে কোলে নিতেন, কখনো এমন হত যে, তারা রসূল করীম (সা.)-এর কোলে পেশাব করে দিত। আর এ কারণে উপস্থিত কেহ হাহুতাশ করলে তিনি (সা.) তাদের বলতেন, "তোমরা শিশুদের পেশাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। শিশুর পেশাব করা শেষ হলে নবী করীম (সা.) তখন এমন ব্যবহার করতেন, যাতে কেহ মনে না করে যে, হুযূর (সা.) কষ্ট পেয়েছেন। এ অবস্থায় হুযূর (সা.) শিশুদের নাম রাখতেন ও তাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করতেন। শিশু এবং তার পিতা-মাতা চলে যাবার পর হুযূর (সা.) নিজের হাতে কাপড় ধুয়ে ফেলতেন।" (ইসলাম ও জীবন) সন্তানদের মাঝে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী এবং নামাযের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পণা নিয়ে, প্রেম-প্রীতি আর ধৈর্যের সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মা-বাবার নৈতিক দায়িত্ব। প্রত্যেক মায়ের উচিত তার সন্তানকে সাথে নিয়ে বা কাছে রেখে নামায আদায় করা। মায়ের কোল ছেড়ে শিশু যখন হাঁটতে শুরু করবে তখন পিতার দায়িত্ব শিশুকে সাথে করে মসজিদে যেয়ে বাজামাত নামায আদায় করা। এ সময় শিশু তার স্বভাব সূলভ আচরণ প্রদর্শন করতে যেয়ে মসজিদের ভিতরে দৌড়া-দৌড়িসহ নানা রকম বিরক্তিকর কাজ করতে পারে, এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বকা ঝকা বা মারপিট করা উচিত নয়। এ অবস্থা হলে তাকে হিকমত ও ভালোবাসার মাধ্যমে নিজের দখলে রাখতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত রসূল করীম (সা.) নামায আদায় করছিলেন। আর তখন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) হুযূর পাক (সা.) কে সেজদাহ্রত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসলেন, হুযূর (সা.) তাঁর সেজদাহ্ দীর্ঘ করলেন, তারা না নামা পর্যন্ত তিনি নামিয়ে দিলেন না। নামাযে সালাম ফিরালে সাহাবাগণ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আপনি নামায দীর্ঘায়িত করছেন। রসূল করীম (সা.) উত্তরে বললেন, 'আমার আদরের দুলালরা নামাযে আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছেন, কাজেই তাদেরকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেওয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।(প্রাগুক্ত) হযরত রসূল করীম (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) শিশুসুলভ স্বভাবের কারণে কোন কোন দিন সেজদাহ্র জায়গায় বসে খেলা আরম্ভ করতেন। হুযূর (সা.) সেজদায় যাবার সময় স্বীয় মোবারক হাতে তাদের সরিয়ে সেজদাহ্ দিতেন।" সৈয়্যদুল আম্বিয়া, খাতামুল মুরসালিন, রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন, হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু আপনজনদের বিরক্তি সহ্য করতেন এমনটা নয়। অন্যের শিশুদের তরেও ছিল তাঁর হৃদয়ে গভীর ভালবাসা। তখন মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমআর নামায ও ঈদের নামায় আদায় করতে মসজিদে আসতেন, কখনো কখনো এমনটা হতো যে, শিশুর কান্নার আওয়াজ নবীজির কানে ভেসে আসত। এমতাবস্থায় শিশু অধীকারের স্বর্গীয় প্রবক্তা, দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সা.) একথা বলেননি যে, আপনারা শিশুদের কান্না থামান, তাদের নিয়ে বাড়িতে চলে যান, যে মায়েরা শিশুর কান্না বন্ধ করতে পারেন না তারা মসজিদে আসবেন না। বরং তিনি (সা.) বাচ্চা ও তার মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে খুৎবা ও নামায সংক্ষেপ করতেন।" মুসলিম ও নেসাঈ শরিফ হতে সংগৃহিত)

শুধু কি মুসলিম শিশুর কান্না আর কষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্তর আত্মাকে বিগলিত করত? না অমুসলিমদের শিশুর কষ্টে বিচলিত হয়ে তিনি (সা.) মহব্বতের বাহু সম্প্রসারিত করতেন? হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, হুযূর (সা.)-এর নেতৃত্বাধীন কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলে হযরত রসূল করীম (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। এবং উপস্থিত সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন যে, "আজ থেকে ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে তোমরা নারী আর শিশুদেরকে হত্যা করবে না। তোমরা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। মনে রাখবে যে, তাদের বদৌলতেই তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে রিযিক পাচ্ছ। (প্রাগুক্ত) একবার ঈদের নামাযান্তে হযরত মুহাম্মদ (সা.) দেখলেন যে, একটি শিশু মুরুভূমির উত্তপ্ত বালুকায় বসে কাঁদছে। রসূল করীম (সা.) বালকটির নিকট এগিয়ে গিয়ে তার সাথে আলাপ-চারিতায় জানতে পারলেন যে, সে ইহুদি গোত্রের সন্তান, কোন এক যুদ্ধে তার পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করেছেন, পৃথিবীতে তার আপনজন বলতে কেউ নেই। শিশুটির করুণ কাহিনী শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন যে, 'হে প্রিয় বৎস ! তুমি যদি আমার ন্যায় পিতা আর হযরত আয়শা (রা.) এর ন্যায় মাতা এবং হযরত ফাতেমা (রা.) এর ন্যায় বোন পাও তবে কি তাদের পছন্দ করবে'? শিশুটি মাথা

নেড়ে সম্মতি জানালো। নবী করীম (সা.) শিশুটিকে নিয়ে বাড়িতে এলেন এবং হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.) কে ডেকে বললেন, হে আয়শা! আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একটা সুন্দর-সুশ্রী পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছেন। হযরত উম্মূল মু'মিনীন আয়শা ছিদ্দিকা (রা.) এগিয়ে এলে রসূল করীম (সা.) কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন এবং বললেন, এ শিশুটি আল্লাহ্‌র রসূলের পক্ষ থেকে তোমার নিকট আমানত। তাকে অতি আদর-যত্নের সাথে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করবে।" সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে মা-বাবাকে শিশুদের মনমানুষিকতা বুঝে-শোনে কাজ করতে হবে। নচেৎ সুফলের পরিবর্তে কুফলের সম্ভাবনা রয়েছে। আদর-যত্ন, মায়া-মমতা, স্নেহ-সোহাগ দ্বারা নিজেকে শিশুর আপনজন হিসেবে পরিণত করতে পারলে কাজটি সহজ হয়ে যায়। শুধু গুরু নয় শিশুর খেলাধূলার সাথীতে পরিণত হতে হবে। প্রিয়জনদের সামনে শিশুকে তিরস্কার নয়ঃ করতে হবে প্রশংসা।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, "একবার আমি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সন্ধানে তাঁর বাড়ির দরজায় উপস্থিত হয়ে যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অবলোকন করেছি, তা আমার জীবনের সেরা দর্শন। আমি দেখলাম আমার প্রাণাধিক প্রিয় ইমাম জগতের সর্বকালের সেরা মানুষ তিনি ঘোড়ার ন্যায় উপর হয়ে রয়েছেন। আর তাঁর আদরের ধন, কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) গামছা জাতীয় কোন কাপড় দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখে লাগাম লাগিয়ে তাঁর মোবারকময় পিঠে সওয়ার হয়েছেন। আমার প্রাণাধিক প্রিয় ইমাম আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) সওয়ারদ্বয়কে বহন করে উঠানের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে ছুটে চলছেন। আমার প্রিয় ইমাম আল্লাহ্‌র হাবীব যখন ঘোড়ার ন্যায় দুলকী চালে চলছেন, তখন হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এ অসাধারণ দৃশ্য উপভোগ করার পর আমি সালাম দিয়ে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অনুমতিক্রমে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম । এর পর হযরত আলী তনয় হাসান ও হোসাইনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আজ তোমরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ। তোমাদের ঘোড়ার ন্যায় মহামূল্যবান ও মহামর্যাদার অধিকারী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার সৌভাগ্য না কেউ অতীতে অর্জন করেছে, না কেউ ভবিষ্যতে করবে। সুতরাং মনের খায়েশ মিটিয়ে ঘোড়াকে দাবড়িয়ে নাও। আমার মন্তব্য শুনে আল্লাহ্‌র হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নয়নের মনি, আদরের ধন, কলিজার টুকরা সওয়ারীদ্বয়কে কোলে তুলে নিয়ে চুমো দিয়ে আদর করতে করতে বললেন,"হে ওমর ! তুমি শুধু ঘোড়ার মুল্যটাই নিরূপণ করলে, 'আমার নিকট কিন্তু ঘোড়ার অপেক্ষা সওয়ারীদ্বয়ের মুল্যও কিন্তু কম নয়" (হায়াতে সাহাবা)। হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, "একবার আমরা হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে কোন এক স্থানে দাওয়াত খেতে যাচ্ছিলাম। এ সময় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) রাস্তায় খেলা করছিলেন। হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁকে সাথে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলে, সে বার বার লুকোচুরি খেলার ন্যায় এদিক সেদিক ছুটে যেতে লাগল। অনেক চেষ্টার পর রসূলে করীম (সা.) তাকে ধরতে সক্ষম হলেন। ধরার পর এক হাত চিবুকের নীচে আর এক হাত মাথার পিছনে রেখে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে আদর করতে লাগলেন। এরপর বললেন,'হোসাইন আমার আর আমি হোসাইনের'। যে ব্যক্তি হোসাইন (রা.) কে মহব্বত করবে, আল্লাহ্ও তাকে মহব্বত করবেন।" (বায়হাকি)।

দো'জাহানের বাদশাহ্, সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমাতুজ্ জহুরা (রা.) এর গৃহে গমন করে, হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) কে কান্নারত অবস্থায় পেলেন। তিনি তাঁর আদরের কন্যা হযরত ফতেমা (রা.)-এর নিকট কলিজার টুকরাদ্বয়ের কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) জানালেন যে, গৃহে কোন খাবার নেই। ওরা ক্ষুধার তাড়নায় কষ্ট পাচ্ছে। এ কথা শ্রোবণ মাত্র দু'দিনের অনাহারী হাবীবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে গেলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এক ইহুদির বাগানে ইন্দিরা থেকে বালতির সাহায্যে পানি সেঞ্চনের কাজ পেলেন। আল্লাহ্‌র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনেক কষ্টে ঐ কাজ শেষ করে কিছু খেজুর এনে হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-কে আহার করালেন (মুত্তাফিক আলায়হে)। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-'সেই ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট পাপ যে, সে তার অধীনস্থ, যাদের আহার যোগায়, তাদের চাহিদা অস্বীকার করে (আবু দাউদ)। কথায় বলে, শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে। আজকের দোলনায় দোল খাওয়া শিশুটি, আগামি দিনে দেশ ও দশের কর্ণধার। অতএব তার মাঝে সুপ্ত সুন্দর, সত্য, শ্বাসত অনুপম পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলি সমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। আর এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক শিশুর বিচরণক্ষেত্র যেমন সংসার বা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে 'উসওয়াতুল হাসানা'- মানবতার সর্ব্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন। আমরা যারা বড় তাদের স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা আর বিগলিত চিত্তে খোদার দরবারে দোয়া করার চেয়ে সন্তান-সন্ততির তরবিয়তের জন্য উত্তম কোন ব্যবস্থা জগতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

প্রশংসিত মানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)

সাকিবুল হাসান
ছাত্র [৫ম বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

যিনি পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিকুলের ও মানবজাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে এবং সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসিত, তিনিই প্রশংসিত মানব। যিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসা প্রাপ্ত, তিনি প্রশংসিত মানব। যার প্রশংসা সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ, তিনি প্রশংসিত মানব। যার শরিয়তে পূর্বের নবীরাও নবী ও উম্মতি হবার আকাঙ্খা রাখে, তিনি প্রশংসিত মানব। যার সুপারিশে জান্নাত লাভ হয়, তিনি প্রশংসিত মানব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাও যার সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করেছেন, তিনি প্রশংসিত মানব। আল্লাহ্ তা'লা সেই প্রশংসিত মানবের নাম রেখেছেন 'মুহাম্মদ' যার আক্ষরিক অর্থও প্রশংসিত। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে সেই প্রশংসিত মানবের প্রশংসা এভাবে করেছেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(আল ইমরান, ৩২)

অর্থ : তুমি বল, "তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর। এমনটি হলে আল্লাহ ও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন।

আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে কত ভালোবাসেন যে, ঘোষণা করেছেন, মুহাম্মদ (সা.)-কে ভালো না বাসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে না। একবার ভাবুন, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর কাছে কতটা প্রেমাস্পদ, কতটা প্রশংসা তিনি (সা.) কুঁড়িয়েছেন, যার কারণে আল্লাহ্‌কে পেতে চাইলে প্রথমে তাকে (সা.) ভালোবাসতে হবে এবং তাঁর (সা.) আনুগত্য করতে হবে। খোদা তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে অন্য কোন নবীর উম্মতের জন্য এমন শর্ত আরোপ করেন নাই যে, সমসাময়িক নবীকে ভালোবাসলেই আল্লাহ্র ভালোবাসা পাওয়া যায় বরং আল্লাহ্ তা'লা শুধু মুহাম্মদ (সা.)-কে এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাকে (সা.) ভালোবাসলে আল্লাহ্র ভালোবাসা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র কাছে কতটা প্রশংসিত তা আমাদের চিন্তা শক্তির উর্দ্ধে। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রশংসিত মানবের প্রশংসায় ফিরিশতা ও মুমিনদের আদেশ দেন তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর। কুরআনের ভাষায় তা এমন

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(সূরা আহযাব : ৫৭)

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ এই নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে), হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ এবং অনেক সালাম প্রেরণ কর।

আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এতই সন্তুষ্ট যে, তাঁর (সা.) প্রতি ফিরিশতা ও মুমিনদেরকে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন:
"এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে আকরাম (সা.)-এর কার্যাবলী এরূপ ছিল, এগুলোর প্রশংসা বা বৈশিষ্ট্যে সীমারেখা টানার জন্য আল্লাহ্ তা'লা কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। শব্দ তো পাওয়া যেত, কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ, তাঁর (সা.) কর্মের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য ছিল সীমাতীত। এ ধরনের আয়াত আল্লাহ্‌তা'লা অন্য কোন নবীর (আ.) সম্মানে ব্যবহার করেন নি। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪)

বিরুদ্ধবাদিরাও সর্বদা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করেছে, যদিও তারা ধর্মীয় মতভেদের কারণে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরোধিতা করত কিন্তু অপরদিকে তারা সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রশংসা জানাতে দ্বিধাবোধ করত না। কারণ, মুহাম্মদ (সা.)-এর কিশোর বয়সের সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, নম্রতা ও ভদ্রতা, নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও সত্যিকার কল্যাণের প্রচেষ্টা, চারিত্রিক মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারের ফলে আরবরা তাঁর (সা.) প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশেষে আরবগণ তাঁকে (সা.) 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত বলে ডাকতে থাকে।

কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের পর হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ ও রক্তপাতের প্রবল আশংকা দেখা দিয়েছিল সেটিও মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সমাধান হয়। যখন ফয়সালা হল, যে ব্যক্তি

সর্বপ্রথম ফজরের পূর্বে কা'বা ঘরে ইবাদত করার জন্য আসবে সেই ব্যক্তির মীমাংসা সকলে মেনে নিবে। তাই সকলে চিন্তিত ছিল না জানি কে সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করে। এমন সময় দেখা গেল কুরাইশ বংশীয় যুবক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এদিকে আগমন করছেন। তাঁকে (সা.) আসতে দেখে সকলেই আনন্দিত হয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠল, "হাযা মুহাম্মাদুন আল আমীনু ক্বাদ রাযিনাহু" অর্থাৎ, এই তো আমাদের মুহাম্মদ আল-আমীন, আমরা তাঁর মীমাংসায় সম্মত আছি। তিনি (সা.) তখন একটি চাদর আনতে বললেন এবং প্রত্যেক গোত্রের একজন করে প্রতিনিধিকে সেই চাদর ধরতে বললেন এবং মুহাম্মদ (সা.) হাজরে আসওয়াদ সেই চাদরে রেখে কা'বা ঘরের নির্দিষ্ট কোণে স্থাপন করলেন। নবুওয়ত লাভের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার কারণে পবিত্র মক্কার জনগণ সম্ভাব্য এক ভয়াবহ যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে রক্ষা পেল এবং অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর (সা.) প্রশংসা করতে লাগল। অর্থাৎ তিনি (সা.) এমনি এমনিই প্রশংসিত মানব হয়ে যান নাই। তিনি (সা.) আল্লাহ তা'লার রঙে রঙিন হয়েছিলেন। তিনি (সা.) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি (সা.) প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) সকল পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। পানাহারে সরলতা ও খোদাভীরুতা, বিছানা ও শয্যার ব্যাপারে সরলতা, খোদাতা'লার সঙ্গে প্রেম এবং ইবাদত, খোদাতা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার, গরীবদের প্রতি খেয়াল, গোলাম বা দাসদের প্রতি উত্তম ব্যবহার, নারীজাতির প্রতি উত্তম আচরণ, প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি উত্তম ব্যবহার, অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও চুক্তিরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি (সা.) ছিলেন জীবন্ত আদর্শ। যার ফলে তিনি (সা.) প্রশংসিত মানবে পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি (সা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি। তাই তো ইহুদী ও খৃষ্টান বড় বড় লেখকরাও মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রশংসা করতে বাধ্য হন। এর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি :

*জন উইলিয়াম ড্রপার ১৮৭৫ সালে তার বিশ্ববিখ্যাত 'A history of the intellectual development of Europe' গ্রন্থে স্বীকৃতি প্রদান করেন যে, 'Four years after the death of Justinian, in AD 569, was born at Mecca, in Arabia, The man (Muhammad) who of all men, has exercised the greatest influence upon the human race'.

অর্থাৎ, সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন মুহাম্মদ, যিনি পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মানবজাতির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।

*এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকার মত নির্ভরযোগ্য প্রকাশনাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

``He (Muhammad) is the most successful of all prophets and religious personalities'' (Encyclopedia Britannica, 11th edition, Article on Quran)

অর্থ: জগতের সকল ধর্ম-প্রবর্তক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি হলেন সর্বাপেক্ষা সফল।

*বিশ্ববিখ্যাত মনিষী টমাস কারলাইল ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে এডিনবার্গে আয়োজিত সভায় ঘোষণা করেন :

"শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বা নবী-রসূলদের ন্যায় অতি সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যেও `Hero' বা 'নায়ক' এর স্থান অধিকার করে আছেন সুদূর আরবের উষ্ট্রচালক হযরত মুহাম্মদ।

On Heroes, Hero Worship and Heroic in History : Hero as prophet শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি নবী করীম (সা.) কে-ই নবী ও রাসুলদের মধ্যে `Hero' হিসেবে পরিচিত করেন। উপরোক্ত উক্তিসমূহ থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, যেই ইহুদি খৃষ্টানরা সবসময় ইসলামকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারাই এখন বলছে যে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী-রসূল এসেছেন তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা.)-ই শ্রেষ্ঠ। এ তো গেল বিভিন্ন মনিষীদের ভাষ্য। এখন আমরা দেখব পূর্বের নবী-রসূলরা তাদের কিতাবসমূহে কি গুণকীর্তন করে গিয়েছেন মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে।

হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। অথর্ব বেদের অথ কুন্তাপ সুজ্ঞানী পর্বের প্রথম মন্ত্রে যে ঋষির প্রশংসা করা হয়েছে তার নাম 'নরাশংস'। নরাশংস অর্থ হল প্রশংসিত। (ড. দেব প্রকাশ উপাধ্যায়, কল্কি অবতার এবং মুহাম্মদ সাহেব, পৃষ্ঠা : ৬৬)

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হযরত গৌতম বুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তিনি তার শিষ্য আনন্দকে বলেন, আনন্দ! এই পৃথিবীতে আমি প্রথম বুদ্ধ নহি এবং অন্তিম বুদ্ধও নহি। এই পৃথিবীতে সত্য এবং পরোপকার শিক্ষা দান করার জন্য সময়মত একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তিনি পূতঃপবিত্র অন্তকরণের হবেন। তিনি সকল লোকদের নায়ক ও পথপ্রদর্শক হবেন। যদ্রুপ আমি পৃথিবীতে সত্য শিক্ষা দিয়েছি তিনিও তদ্রুপ পৃথিবীতে এমন জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠা করবেন যা একাধারে পবিত্র ও পূর্নাঙ্গ হবে। আনন্দ! তার নাম হবে "মৈত্রীয়"। (বেদ ও পুরানে হযরত মুহাম্মদ (সা) ড. দেব প্রকাশ উপাধ্যায় পৃষ্টা : ৬৩) এখানে বুদ্ধ (আ.) শেষ যুগে আগত নবীর নাম মৈত্রীয় বলে উল্লেখ করেন। এই মৈত্রীয় শব্দের অর্থও 'প্রশংসিত'।

ইঞ্জিলের ৪র্থ অধ্যায়ে লেখা রয়েছে, হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আমার পরে যে মহামানব আসতে যাচ্ছেন তার নাম হবে 'আহমদ'। আবার এই অধ্যায়েই অন্য এক স্থানে তার নাম

"ফারকলিত" বলা হয়েছে যার অর্থও মুহাম্মদ বা প্রশংসিত মানব। তওরাত এর দ্বিতীয় বিবরণী (১৮:১৮-২০) অধ্যায়েও মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখার বিষয় খোদা তা'লার কতটা প্রিয় হলে একজন নবীর আবির্ভাবের সংবাদ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ থাকতে পারে!

এমনকি মূসা (আ.)ও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহতা'লা বললেন, তুমি পূর্বেই নবী হয়ে এসেছ। তখন তিনি একজন সাধারণ উম্মতি হওয়ার দাবী করেন। আল্লাহতা'লা তাও মানা করে দেন এবং বলেন, তাঁর (সা.) উম্মত থেকেই উম্মতি নবী হবে। তাই আজ তাঁর (সা.) অনুসরণ ও প্রশংসা করার মাধ্যমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) নবুয়ত লাভ করেছেন। তাই আজ মুসলমানদের চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁর (সা.) প্রশংসায় কত সহস্রবার দরূদ পরা উচিত। কতটা প্রশংসা করা উচিত এই প্রশংসিত মানবের জন্য, যার কারণে আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও বলেছেন, যে ব্যাক্তি আমার নাম শুনেও দরূদ পাঠ করে না তার চেয়ে বড় কৃপণ আর পৃথিবীতে নেই। তাই যখনই আমরা তাঁর (সা.) নাম উচ্চারণ করবো বা শুনবো তখনই আমরা দরুদ পাঠ করার চেষ্টা করবো। তাই এই প্রশংসিত মানবের জন্য সর্বদা চলার ক্ষেত্রে, কাজ কর্মের ফাঁকে, নামাযে, ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকেই প্রশংসিত মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, খাতামান্নাবীঈন ও রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শাফায়াত লাভের তৌফিক দান করুন।

(আমীন)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য মোদের প্রাণ উৎসর্গীত।
প্রিয়ের গলির পথ প্রদর্শক যে তিনিই।
মোর অন্তর তিনি করে দিয়েছেন আলোকিত।
তিনিই মোর আঁধার ঘরের প্রদীপ।
[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)]

মি'রাজ ও ইস'রা

আবু সালেহ্ আহমদ
ছাত্র [৪র্থ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মি'রাজ এবং ইসরা নিয়ে ইসলামের মাঝে মতপার্থক্য লেগে রয়েছে। যা আমাদের সকলেরই কম-বেশী জানা। এই মতপার্থক্যগুলো আঁ-হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর কিছু সময় পর থেকে আরম্ভ হয়ে আজ পর্যন্ত বিরাজমান। আমরা সেদিকে যেতে চাই না বরং আমরা এখন দেখব যে, মিরাজ ও ইসরা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস কি বলে। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছু মুসলমানও এটাই মনে করে যে, মিরাজ ও ইসরা একই ঘটনার দুটি ভিন্ন নাম মাত্র। কিন্তু কুরআন, হাদিস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই দুটি ঘটনা রূহানী দিক দিয়ে কাছাকাছি হলেও প্রকৃতপক্ষে মিরাজ ও ইসরা দুটি আলাদা আলাদা ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মিরাজ সেই রূহানী সফর যেখানে মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কা থেকে আকাশ পর্যন্ত নেয়া হয়েছিল এবং শেষে তিনি (সা.) মহান আল্লাহ তা'লার সঙ্গেও সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে ইসরা ভিন্ন আরেকটি সফর যেখানে মুহাম্মদ (সা.)-কে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত রূহানী সফর করানো হয়েছিল। কুরআন শরীফ এই দুটি ঘটনাকে আলাদা আলাদা সূরায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছে। সূরা নজমে আঁ-হযরত (সা.)-এর যে রূহানী সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মি'রাজ। যেভাবে সহীহ বুখারীতে সূরা নজমের আয়াতকে মি'রাজের দিকে ইশারা করা হয়েছে। (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)

অন্য দিকে সূরা বনী ইসরাঈলে যে সফরের বর্ণনা দেয়া আছে তা ইসরা। আর এই দুটি সূরার দুটি বর্ণনায় একটি অপরটির সাথে দূরতম সম্পর্কও নেই। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলে ইসরার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে আকাশের কথা কোথাও উল্লেখ নেই, সেভাবেই সূরা নজমে বায়তুল মুকাদ্দাসেরও কোন কথা উল্লেখ নেই। আর ঠিক একই রূপে হাদিসেও মিরাজ আর ইসরা আলাদা আলাদা ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত। বুখারী শরীফ যা ইসলামে কুরআনের পরে সবচেয়ে বিশ্বস্ত মনে করা হয় সেখানেও এই দুটি ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এটাই এই দিকে ইশারা করছে যে, এ দুটি ভিন্ন ঘটনা। যেখানে মিরাজের কথা বলা হয়েছে সেখানে মক্কা থেকে সরাসরি আকাশে নিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে আর ইসরার সময় মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য সীরাতের বই 'সীরাত ইবনে হিশাম' এ দুটি ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তুলে ধরেছে। প্রকৃতপক্ষে রূহানী দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি ঘটনার মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও বাহ্যিকভাবে এ দুটি আলাদা আলাদা ঘটনা। এ তো গেল একটি বিষয় মাত্র, কিন্তু এর চেয়েও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা নিয়ে অনেক বড় পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছে আজকের এই ইসলামের ইতিহাস। আর তা হল, আঁ-হযরত (সা.)-এর এই দুই সফর বাহ্যিক শরীর নিয়েই হয়েছে বলেই ধারণা করা হয়। বলা হয়ে থাকে তিনি (সা.) তাঁর রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই এই সফর করেছেন। কিন্তু কুরআন এই কথাকে খন্ডন করে। যেমন কুরআনে মি'রাজ সম্পর্কে বলা আছে

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ

(সূরা নজম-১১) অর্থাৎ এই ঘটনায় মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয় যা দেখেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য এবং তাঁর হৃদয় এসব দৃশ্য দেখতে ও অনুধাবন করতে কোন ভুল করেনি। এথেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় এ সফর ছিলো রূহানী যা হৃদয়ের মাধ্যমে হয়েছে শরীরের মাধ্যমে নয়। আর এ কথা হাদিসেও পাওয়া যায় যে, মি'রাজ নবী করীম (সা.)-এর একটি রূহানী সফর ছিলো। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যেই সময়ে আঁ-হযরত (সা.)-কে আকাশে উঠানোর দৃশ্য দেখানো হলো সেই সময় তিনি (সা.) শুয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ শুয়ে থাকা সাধারন মানুষের মত নয় বরং যা শানে নবুয়তের সঙ্গে সর্ম্পক রাখে যেখানে তাঁর চোখ তো বন্ধ থাকে কিন্তু হৃদয় জাগ্রত থাকে (বুখারী)। আবার অন্য আর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, মি'রাজের ঘটনা তিনি (সা.)-এর ঘুমন্ত ও জাগ্রত এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় দেখানো হয়েছিলো। (বুখারী, আবওয়াবু বাদইল খালক, বাব যিকরে মালায়েকা)

আবার তৃতীয় বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ''এরপর তিনি (সা.) জেগে উঠলেন'' (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)। আবার হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আর একটি হাদিসে আছে যে, 'যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এ কথা বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) মি'রাজের সময় তাঁর এই রক্ত মাংসের চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখেছেন তবে তার কথা বিশ্বাস করো না। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমার তো এ কথা মনে করেই শরীরের লোম শিউরে উঠে যে, তিনি (সা.) তাঁর বাহ্যিক চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে দেখেছেন। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর, বাব তফসীরে সূরা নজম)

আর এভাবে ইসরা সম্পর্কেও কুরআন ও হাদিস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, ইসরাও রূহানী ভাবে হয়েছিল, বাহ্যিক ভাবে নয়। কুরআন এ সম্পর্কে তিনটি কথা বলেছে, প্রথমতঃ এই সফর রাতের বেলা হয়েছিলো যা إِسْرَآء শব্দের দিকে ইশারা করে, দ্বিতীয়তঃ এই সফর এক রাতের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছিলো যা لَيْلًا শব্দ দ্বারা বুঝায়। আর তৃতীয়তঃ এই সফরের উদ্দেশ্য এটাই ছিলো যে, আমরা আমাদের রসূলকে আমাদের নিদর্শন দেখাব। এদিকে আমরা এটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখতে পাই, এই তিনটি কথাই ইসরাকে রূহানী সফরের দিকে ইঙ্গিত করে বাহ্যিক বা দৈহিক সফরের দিকে নয়। কারণ, সাধারণত সফর দিনের বেলায় হয়ে থাকে কিন্তু রূহানী সফর রাতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। তাছাড়া রাতের কথার উল্লেখ করে এখানে অন্য কোন কথা পরিলক্ষিত হয় না। আর কেবল এক রাতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমন করা সম্ভব নয়। আর ইসরা সম্পর্কে এভাবে হাদিসেও একই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন আঁ-হযরত (সা.) বলেন যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করালেন। তখন সেখানকার কিছু কাফের যারা বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিল তারা বললো যদি আপনার এ কথা সত্য হয় তাহলে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন চিহ্ন বর্ণনা করুন। তখন তিনি (সা.)-এর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিল। কেননা তিনি (সা.) জানতেন এটা এক রূহানী সফর, এর সাথে বাহ্যিক মিল নাও থাকতে পারে। তখন আল্লাহ্ তা'লা কাশফিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসের দৃশ্য তাঁকে দেখালেন তখন তিনি কাফেরদের কে সেই চিহ্ন গুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে শুরু করলেন। (বুখারী, তফসীরে সূরা বনী ইসরাঈল)

আর যদি ইসরা দৈহিকভাবেই হয়ে থাকতো আর মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বাহ্যিক চোখ দিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসকে দেখতেন তা হলে কাফেরদের আপত্তিতে তিনি (সা.) চিন্তিত হতেন না আর আল্লাহ্ তা'লা আর একবার বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তাঁর সামনে আনতেন না। কুরআন ও সহীহ্ হাদিস থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর দুটি রূহানী সফর, কিন্তু যারা তা মানে না তাদের কাছে দুর্বল দলিল ছাড়া অন্য কিছুই নাই। আল্লাহ তা'লা আমাদের উক্ত মো'জেযা বুঝার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে ২০১৫ সালে যারা শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেছেন

হাজারী আহমদ আল মুনিম

সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ

নাভিদুর রহমান

মোহাম্মদ আল হক

জুনায়েদ ইসলাম

মোহাম্মদ সালেহ্

জুবায়ের আহমদ

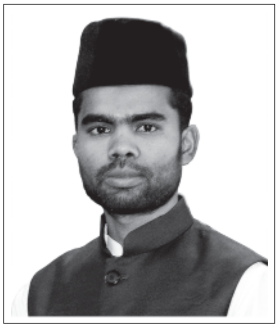
মোস্তাফিজুর রহমান

'নাযেরে আলা সাহেব কাদিয়ান'-এর সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের
পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

'প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান'-এর সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

কাশ্মীরে ভ্রমনরত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪র্থ শাহেদ ব্যাচ ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

কাদিয়ানের বাঙালি দরবেশ জনাব তৈয়্যব আলী সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

ফজলে ওমর প্রিন্টিং প্রেসের ইনচার্জ মোহতরম মুনির আহমদ হাফেযাবাদি সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

কাদিয়ানের ঐতিহাসিক মসজিদ 'মসজিদ নূর'-এর সামনে সেখানকার স্থানীয় আহমদীদের সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

কাদিয়ানে আগত মায়ানমার, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার আহমদী বন্ধুদের সাথে
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

দিল্লিতে অবস্থিত বাহাই উপাসনালয় 'লোটাস টেম্পলের' সামনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

দিল্লির মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ুনের মাজারের সামনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

অমৃতসরে অবস্থিত শিখ উপাসনালয় 'স্বর্ণ মন্দির'-এর সামনে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

হিমাচলের রাজধানী শিমলার নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকনরত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের পঞ্চম শাহেদ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

'সেন্ট মার্টিন' শিক্ষা সফর-২০১৫ তে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

'রাঙ্গামাটি' শিক্ষা সফর-২০১৬ তে কাপ্তাই লেকে নৌ ভ্রমনের আনন্দ নিচ্ছে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক পিকনিক-২০১৫ তে যমুনা নদীর নৌ বিহারে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ

পিকনিক-২০১৬ তে সীতাকুন্ডে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ

রাঙ্গামাটি শিক্ষা সফর-২০১৬ তে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ রাঙ্গামাটির 'মাইনি বাজার' লঞ্চঘাটে

রাঙ্গামাটি শিক্ষা সফরে যাওয়া জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছাত্র ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ বান্দরবনের এক বৌদ্ধ মন্দিরের সামনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে

বার্ষিক দশ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী ছাত্রবৃন্দ ও নিগরান শিক্ষকবৃন্দ
মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার সামনে

বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করছে জামেয়ার শিক্ষার্থীগন

জামেয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহনকারী দলসমুহের গ্রুপ ছবি
দল : আমানত

জামেয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহনকারী দলসমুহের গ্রুপ ছবি
দল : শুজাআত

জামেয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহনকারী দলসমুহের গ্রুপ ছবি
দল : রাফাকাত

জামেয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহনকারী দলসমুহের গ্রুপ ছবি
দল : সাদাকাত

বিশ্ব নবীর (সা.) সত্তায় আরোপিত আপত্তির অপনোদন

মসীহ্ উর রহমান
ছাত্র [৬ষ্ঠ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পৃথিবী যখন অন্যায়, অবক্ষয়, অনাচার, কদাচার আর কুসংস্কারের তিমির অমানিশায় নিমজ্জিত ছিল তখন আমাদের মনিব, খাতামুল আম্বিয়া, সাইয়েদুল মুরসালীন, খাতামান্নাবীঈন, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর শান্তির প্রদীপ হাতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি (সা.) আপন চারিত্রিক বৈশিষ্টের সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের সত্ত্বাকে এমন সুউচ্চ মর্যাদার আধিষ্ঠিত করেছেন যে, স্বয়ং খোদা তা'লা ঘোষণা করেছেন যে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ মহান আল্লাহ এই কামেল নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন, ফেরেশতারাও এই নবীর জন্য দোয়া করে। সুতরাং হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও এই নবীর প্রতি অনবরত দরুদ ও আশীষ প্রেরণ কর। (সূরা আহযাব, ৫৭)

নবী করীম (সা:) এর জীবনাদর্শ ও কার্যাবলী এতই প্রশংসিত ছিল যে, তাঁর (সা.) প্রশংসায় আল্লাহ ত'লা নির্দিষ্ট কোন শব্দ ব্যবহার করে তাঁর (সা.) মর্যাদাকে সীমাবদ্ধ করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.) কর্মের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট ছিল সীমাতীত। আল্লাহ তা'লা অন্য কোন নবীর স্বপক্ষে এরকম ঘোষণা দেন নি, যা হযরত মুহম্মদ (সা.) -এর স্বপক্ষে উক্ত আয়াতে দিয়েছেন। তাঁর (সা.) বিশ্বস্ততা, খোদাভীতি, বিনয় ও কর্ম খোদা তা'লার নিকট এত পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ তা'লা পরবর্তী লোকদের চিরকালের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা কৃতজ্ঞভরে তাঁর (সা.) প্রতি দরুদ প্রেরণ করতে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহ এক অমোঘ বিধান করে রেখেছেন। আর তা হল পৃথিবীতে সত্য নবীর বিরুদ্ধাচরণ করা। আল্লাহ্ বলেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

(সূরা ইয়াছিন, ৩১)

অর্থাৎ, ঐশী নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ প্রেরিত মহাপুরুষদের পৃথিবীতে বিরোধীতার পাশাপাশি কুৎসিত, মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ ও আপত্তি তোলা হয় যা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হৃদয় সায় দিতে পারে না। যা আঁ হযরত (সা.) এর বেলায় কয়েক গুন বেশী ছিল। তাঁর (সা.) চরিত্র, সত্ত্বা, কর্ম, বিবাহ, পারিবারিক জীবন, ওহী, নবুওয়্যত, সন্তান লাভ, যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়সহ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে দুর্ভাগা মূর্খ্য বিরোধী অমুসলিমরা আপত্তি করেছে যা এখনও চলমান। তারা নবী করীম (সা.)-এর নামে অত্যন্ত গর্হিত, নোংরা, ও জঘন্য আপত্তি করে যার মধ্যে অন্যতম একটি আপত্তি পাঠকদের উদ্দেশ্যে উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করার প্রয়াস রাখছি।

আপত্তি : বিবুদ্ধবাদী অমুসলিমদের অত্যন্ত নোংরা ও হীন অপবাদের একটি হচ্ছে যে , তারা বলে থাকে মুহম্মদ (সা:) তাঁর জৈবিক চাহিদা ও কামনা বাসনা চরিতার্থে বহু বিবাহ করেছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)॥

জবাব : ইসলামের পূর্ববর্তী যুগে আরবে বিবাহের কোনো আইন ছিল না যার ফলে যার যত ইচ্ছা বিয়ে করতো। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, অবাধ যৌনাচার আর ব্যাভিচার ছিল তখনকার নিত্যনৈমত্তিক ব্যপার। কিন্তু মহানবী (সা.) এর আবির্ভাবের পর ইসলাম বিবাহ শাদীর ব্যাপারে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে। কুরআন করীমে বিবাহ সম্পর্কিত যে আয়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বিবাহের চারটি উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। যথাক্রমে:

১। শারিরীক বিভিন্ন রোগ ও কুপ্রভাব থেকে নিরাপদ থাকা, ২। বংশ বিস্তার করা, ৩। জীবন সঙ্গী ও হৃদয়ের প্রশান্তি লাভ, ৪। বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপন।

ইসলাম বলে যে, যদি উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী একটি বিয়ের মাধ্যমে পূরণ না হয় তাহলে তার জন্য এই সকল উদ্দেশ্য অনুযায়ী একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এছাড়া ইসলাম আরও কিছু বিশেষ কারণ উপস্থাপন করে থাকে যার প্রেক্ষিতে একাধিক বিয়ে প্রযোজ্য হয়। প্রথমত: এতিমদের নিরাপত্তা ও প্রতিপালন করা। দ্বিতীয়ত: বিধবাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা । আর তৃতীয়ত: বংশবৃদ্ধি যা হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনী শিক্ষার পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা যদি মহানবী (সা.) এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাই

যে, তাঁর (সা.) একাধিক বিয়ের পিছনে সেই সব কারণ ও উদ্দেশ্যাবলী বিদ্যমান ছিল যা মূলত কুরআন বর্ণনা করেছে। এই উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে তাঁর (সা.) দৃষ্টি বংশবিস্তার এবং বিধবা ও এতিমদের প্রতিপালনের উপর ছিল। এছাড়াও তাঁর (সা.) বিবাহের পিছনে কিছু বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমত, তাঁর (সা.) এর আদর্শ দ্বারা কিছু জঘন্য প্রথা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংশোধন করা। এবং দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু মহিলাকে নিজের তরবিয়তের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তের সেই অংশের শিক্ষা দেওয়া যা গোপনীয়তা রাখে। অর্থাৎ, যা শুধুমাত্র সহধর্মিনী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে শিখানো যায় না।

তিনি (সা.) নিজ জীবনের পুরোটা সময় খোদা তা'লার নির্দেশ ছাড়া একটি কাজও করেন নি। তেমনিভাবে তাঁর (সা.) প্রত্যেকটি বিয়ে ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর (সা.) স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়শা (রা.) ছাড়া রসুলে করীম (সা.) এর সকল বিয়েই বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাদের সাথে হয়েছিল।

হিজরী ৩য় বর্ষে তিনি (সা.) হাফসা (রা.) কে বিয়ে করেন। খুনাইস বিন খুজায়ফা (রা.) হাফসা (রা.) এর স্বামী ছিলেন যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী একজন নেক সাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর খুনাইস বিন খুজায়ফা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে আঁ হযরত (সা.) হাফসা (রা.) এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ৪৭৭)

পুনরায় হিজরী ৪র্থ বর্ষে মহানবী (সা.) যয়নব বিনতে খুজাইমা (রা.) কে বিয়ে করেন। আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌শ নামে আঁ হযরত (সা.) এর এক ফুফাতো ভাই ছিলেন যিনি উহুদ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত যয়নব (রা.) এই শহীদের বিধবা স্ত্রী ছিলেন। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পষ্ঠা: ৫২৮)

একই বছর শাওয়াল মাসে তিনি (সা.) উম্মে সালমা (রা.) কে বিয়ে করেন। উম্মে সালমা কোরাইশ বংশের সাহাবী হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদের স্ত্রী ছিলেন। আবু সালামার মৃত্যুর পর উম্মে সালমা (রা.) এর বিয়ে মহানবী (সা.) এর সাথে সম্পন্ন হয়। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ৫৩০)

তিনি (সা.) আবু সুফিয়ানের কন্যা হযরত হাবিবা (রা.) কে বিয়ে করেছিলেন যার স্বামী হিজরী ৫ম বা ৬ষ্ঠ বর্ষে আবিসিনিয়ায় মারা যায়। তিনি (সা.) বিধবা জুয়ায়রীয়া (রা.) ও বিধবা সাফিয়া (রা.) কে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরীতে বিয়ে করেন। যার এক মাত্র কারণ ছিল তাদের গোত্রের সাথে মৈত্রি সম্পর্ক স্থাপন করা । এটি খুব প্রণিধানযাগ্য ব্যাপার যে, মহানবী (সা.) ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হযরত সাফিয়া (রা.) কে বিয়ে করেন যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ বনু মুস্তালিকের ১০০ পরিবার কে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবে মুসলমান ও বনু মুস্তালিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত সকল বিবাহের পাত্রী ছিলেন বিধবা ও অসহায়। মহানবী (সা.) তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদানের নিমিত্তে এবং মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনের লক্ষ্যে তাদের বিয়ে করেন এবং অত্যন্ত ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার প্রধান করেন। যা পূর্বে বর্ণিত কুরআনী শিক্ষার অনুবর্তী।

তৎকালীন আরব সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কার আর কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যার মধ্যে অত্যন্ত জঘন্য একটি প্রথা ছিল দাস প্রথা । আরবরা ক্রীতদাসদের উপর ব্যাভিচার আর নিপিড়নের নগ্ন নৃত্যে মগ্ন থাকত। কিন্তু তিনি (সা.) ৭ম হিজরী সনে কৃতদাস মারিয়া কিবতিয়াকে বিয়ে করে কৃতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। এবং কৃতদাসদের অধিকার সুনিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এছাড়া তৎকালীন আরব সমাজে পালক পুত্রকে আপন পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকার মনে করা হতো। পালক পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু ইসলাম পালক পুত্রকে উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করে না। তাই এই কুপ্রথাকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) ঐশী নির্দেশে পালক পুত্র হযরত যায়েদের স্ত্রী যয়নব (রা.) কে বিবাহ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

অথাৎ, হে রসূল যখন তোমার পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারিস তার স্ত্রী যয়নব কে তালাক দিয়ে দিল। তখন আমরা তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম যেন এর মাধ্যমে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন হয় যে, পালিত পুত্র ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় হয়ে যায়। (সূরা আহযাব : ৩৮)

আঁ হযরত (সা.) এর বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তদের বিবাহ করার পিছনে সৎ, নেক প্রবৃত্তি ও সমাজ কল্যাণের মহান উদ্দেশ্যই নিহিত ও কার্যকর ছিল। নতুবা এক পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক কেনইবা চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়াকে বিয়ে করবেন। এছাড়া খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর একটি লম্বা সময় তিনি (সা.) বিয়ে করেন নি। এর পর যখন হযরত সওদা (রা.) কে বিয়ে করেন তিনিও বিধবা ও বৃদ্ধা ছিলেন। আমরা যদি একটু মনোযোগ দেই তাহলে দেখতে পাবো যে, আঁ হযরত (সা.) এর সকল বিয়ে ২য় হিজরী থেকে ৭ম হিজরী সনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। যখন মুসলমানদের যথেষ্ট নিরাপত্তা ছিল না। মহানবী (সা.) সহ সকল মুসলমান সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহের আশংকায় থাকতেন। কোনো ধরণের আরাম আয়েশ এর সুযোগ ছিল না। ৭ম হিজরীর পরে মহানবী (সা.) এর জীবনে স্বস্তি আসে এবং জীবনের শেষ তিনটি বছরে তিনি (সা.) আরবের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। এই

সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের সময়েও তিনি (সা.) একটি বিয়ে করেন নি। যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ও প্রমাণিত যে, তাঁর (সা.) উক্ত বিবাহগুলো কোন আরাম আয়েশ, কামনা, বাসনা বা জৈবিক চাহিদা মিটানোর স্বার্থে নয় বরং সামাজিক ভাবে অসহায় নারীদের উত্তম নিরাপত্তা, এতীমদের প্রতিপালন ও বিভিন্ন কুপ্রথা কুসংস্কার দূর করার জন্য করেছিলেন।

এ সম্পর্কে মাষ্টার মারগোলিস যে মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আপত্তিকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। সে তার পুস্তক "মুহাম্মদ" এ বলেন, "মুহাম্মদ (সা.) যে বিবাহসমূহ খাদিজা (রা.) এর পর করেছিলেন তার বিরুদ্ধে অধিকাংশ ইউরোপিয়ান দার্শনিক কামনা বাসনা চরিতার্থের অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি এই কামনা বাসনার জন্য বিয়ে করেন নি । তিনি (সা.) অধিকাংশ বিয়ে জাতীয় ও ইসলামের তবলীগের উদ্দেশ্যে করেছিলেন। কেননা, তিনি চাইতেন তার প্রিয় সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক আরোও গভীর ও ভালোবাসাপূর্ণ হোক। আবুবকর ও উমরের কন্যাদের সাথে বিবাহের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। এভাবে শত্রু এবং বিরোধীদের কন্যাদের সাথে তিনি রাজনৈতিক কারণে বিয়ে করেছিলেন। ("মুহাম্মদ" লেখক: মাষ্টার মোরগালিস, পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৭)

প্রিয় পাঠক! নবী করীম (সা.) এর কামনা-বাসনা, আরাম আয়েশ বিমূখতা ও খোদাভীতির বিরল দৃষ্টান্ত দেখুন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একবার আঁ হযরত (সা.) একটি মোটা চাটাই এর উপর শুয়ে ছিলেন। যখন তিনি (সা.) উঠলেন তাঁর (সা.) পিঠে চাটাই এর দাগ বসে গিয়েছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান আমরা আপনার জন্য আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করি। তখন রসূল (সা.) বললেন, হে ইবনে মাসউদ! পৃথিবীতে আমার আরাম আয়েশ দিয়ে কী কাজ! আমার আর জাগতিক আরাম আয়েশের উদাহরণ সেরুপ যেভাবে এক পথিক রাস্তায় চলছে। সে কিছু মুহূর্তের জন্য গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য বসেছে। বিশ্রাম শেষে পুনরায় সে নিজ রাস্তায় চলা শুরু করে। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

হাদীসে বর্ণিত মহানবী (সা.) এর উক্তিটি তাঁর (সা.) সাদামাটা ও তাকওয়াশীল জীবন যাপনের উত্তম পরিচায়ক। মুসলিম জাতির সর্বোচ্চ নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) দুনিয়ার আরাম আয়েশে মত্ত হন নি। বরং তাঁর (সা.) সকল কর্ম ছিল মহান আল্লহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

অপর এক হাদিসে উল্লেখ আছে, হযরত আসমা বিনতে নোমান এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়, তিনি আরবের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তার বাবার প্রস্তাবে রসূল (সা.) এর সাথে ৫০০ দিরহাম মোহরানায় তার বিবাহ হয়। যখন রসুলে করীম (সা.) নব স্ত্রীর কাছে গেলেন তখন তিনি বলেন যে, আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল কামনা করলে। অনন্তর তিনি (সা.) তার কাছ থেকে ফিরে আসলেন এবং এক সাহাবী কে নির্দেশ দিলেন, আসমা (রা.) কে তার বাবার কাছে পৌছে দিতে। যদিও তার (রা.) বাবা এই বিয়েতে অত্যন্ত খুশি ছিলেন। (তাবকাতুল কুবরা, আল ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা : ৩১৮-৩১৯)

এই হল সেই মহান সত্তার বিনয় ও নম্রতার নিদর্শন যিনি ইচ্ছা করলেই সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর উপর নিজের অধিকার খাটাতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা করেন নাই কারণ, তাঁর (সা.) বিয়ের উদ্দেশ্য কোন পার্থিব কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য ছিল না বরং তাঁর (সা.) মুল লক্ষ্য ছিল খোদার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য সার্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করা। তাছাড়া তিনি কখনও বিবাহের জন্য কুমারী বা সুন্দরীদের প্রাধান্য দেন নি। কেননা, এই বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, হযরত আয়শা (রা.) ব্যতিত তাঁর (সা.) অন্য কোন স্ত্রী যুবতী বা সুন্দরী ছিলেন না। বরং সবাই বৃদ্ধা বা বিধবা ছিলেন।

অধিকিন্তু মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদের সাথে তাঁর (সা.) আদর্শ এবং তাদের ভাষ্য এই অপবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তিনি (সা.) দিনের বেশির ভাগ সময় ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন বাকী সময় ব্যক্তিগত ইবাদত ও রাতে আপন খোদার সান্নিধ্যে তাহাজ্জুদে মগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বদা খোদার প্রেমে মশগুল থাকতেন, দুনিয়ার প্রেমে নয়। তাঁর (সা.) চরিত্রে কাম লোলুপতার লেশ মাত্র ছিল না। যার প্রমাণ আমরা হযরত আয়েশা (রা.) এর এই বর্ণনা থেকে পাই। তিনি তাঁর (সা.) চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ, তাঁর (সা.) চরিত্র ছিল পুরোটাই কুরআনের মত পুতঃপবিত্র। (বুখারী)

তিনি (সা.) স্ত্রীদের মধ্যে অধিকার ও ন্যায়বিচার করার স্বার্থে তাদের মধ্যে রসুল করীম (সা.) এর সান্নিধ্য পাওয়ার দিন ভাগ করে দিয়েছিলেন। একবার হযরত আয়েশা (রা.) এর ভাগের রাত ছিল। যখন রসুল করীম (সা.) তার ঘরে গেলেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! তুমি কি তোমার ভাগের রাতটুকু আমার প্রিয় খোদার ইবাদতে ব্যয় করার অনুমতি দিবে। তখন হযরত আয়েশা (রা.) খুশিমনে মেনে নিলেন এবং তিনি (সা.) নামাজ শুরু করলেন। (বুখারী)

এই হল আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ। যেখানে তিনি (সা.) খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাবার লক্ষ্যে নিরলস খোদার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। ইসলামের বিজয়ের পর যখন তিনি আরবের সম্রাট ছিলেন তখনও তিনি আপন খোদাকে ভুলে আরাম আয়েশ বা কামনা বাসনা কে প্রাধান্য দেন নি। যার ফলে আল্লাহ তাঁকে

(সা.) মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরনীয় আখ্যা দিয়ে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতের (উত্তম ফলের) আকাংঙ্খা করে থাকে। (সূরা আহযাব, ২২)

এছাড়া আমরা যদি অন্যান্য ধমগ্রন্থগুলোর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে, শুধু ইসলাম নয় বরং দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্ম বহুবিবাহের অনুমতি দেয়। যেমন, ইহুদী ধর্মের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে উল্লেখ আছে, "কোন ব্যক্তির দুটি (একাধিক) স্ত্রী থাকতে পারে"। (দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ২১, শ্লোক : ১৫)

আর বনী ইসরাঈল নবীদেরও একাধিক স্ত্রী ছিল। যেমন, হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.) প্রমূখ। হিন্দু ধর্মেও একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে। (মনু, ৯ম অধ্যায়, শ্লোক: ১২২, ১৪৯ ও ১৮৩)

তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণের একাধিক স্ত্রী ছিল বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। (শ্রীকৃষ্ণ, লেখক লালা লাজপত রায়, পৃষ্ঠা: ৯৭, ৯৮)

উপরে আলোচিত ইসলামী শিক্ষা, মহানবী (সা.) এর বিবাহের কারণ ও উদ্দেশ্য, তাঁর (সা.) স্ত্রীদের সাক্ষ্য, বিরুদ্ধবাদীদের স্বীকারোক্তি আর পূর্ববর্তী ধর্মের বিবাহ আইনের মাধ্যমে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিয়মাণ হয় যে, আঁ হযরত (সা.) এর একাধিক বিবাহ নতুন কোন বিষয় বা শরীয়তে সংযোজন নয় বরং তিনি সমস্ত বিবাহ ঐশী নির্দেশ মোতাবেক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি, উম্মতের তরবিয়ত, ইসলাম প্রচার ও অসহায়দের নিরাপত্তা প্রদানের স্বার্থে করে ছিলেন যা অন্যান্য ধর্মও সত্যায়ন করে। সুতরাং তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে কামনা-বাসনা ও জৈবিক চাহিদার নিমিত্তে বহুবিবাহ করার আপত্তি নিতান্তই অমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বিদ্বেষ ও মূর্খতার শামিল। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এই মহান নবী (সা.) এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার এবং তাঁর (সা.) আদর্শ বাস্তবিক জীবনে অনুসরণ করার তৌফিক দিন। (আমীন)।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে ২০১৬ সালে যারা শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেছেন

রুহুল আমিন রিয়ন

শোয়েব আহমদ খন্দকার

খালেদ মুসনাদ খান

মোহাম্মদ বিপ্লব শাহ্

তাহের আহমদ

জাহিদুল ইসলাম

শাক্কুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ) মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি অনন্য মো'জেযা

মেহেদী সুলায়মান
ছাত্র [৪র্থ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। এজন্য আল্লাহ তা'লা মানবসভ্যতার শুরু থেকে নবী-রসূলগনের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়ে এসেছেন এবং সত্য ও মিথ্যার স্পষ্ট পার্থক্য করে দেখিয়েছেন। মানবজাতি স্বভাবগতভাবে সময়ের পরিক্রমায় নবীগণের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করে এবং খোদা তা'লার ইবাদত বাদ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার, শিরক ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়। ঠিক সেই সময় আল্লাহ তা'লা মানবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মানবজাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য রসূল প্রেরণ করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরববাসী যখন অজ্ঞতা, শিরক, পথভ্রষ্টতা, যুলুম-অত্যাচার, কুসংস্কারে পুরোপুরি নিমজ্জিত ছিল তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে সারা বিশ্বের জন্য একজন পথপ্রদর্শক পাঠালেন। যিনি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন খাতামান্নাবিঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সত্যের বিরোধীতা হয়েই থাকে। ঠিক তেমনি মুহাম্মদ (সা.)-এরও বিরোধীতা হয়েছিল এবং মক্কার কাফেররা তাঁর (সা.) নিকট তাঁর (সা.)-এর সত্য হওয়ার প্রমাণ দেয়ার জন্য বিভিন্ন নিদর্শন অথবা মো'জেযার দাবি করছিল। তখন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন মো'জেযা দেখান, যার মাঝে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা অন্যতম। যার বর্ণনা কুরআন করীমে এভাবে এসেছে,

اِقۡتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانۡشَقَّ الۡقَمَرُ ۝ وَاِنۡ یَّرَوۡا اٰیَةً یُّعۡرِضُوۡا وَیَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّسۡتَمِرٌّ ۝
وَکَذَّبُوۡا وَاتَّبَعُوۡۤا اَہۡوَآءَہُمۡ وَکُلُّ اَمۡرٍ مُّسۡتَقِرٌّ ۝
وَلَقَدۡ جَآءَہُمۡ مِّنَ الۡاَنۡۢبَآءِ مَا فِیۡہِ مُزۡدَجَرٌ ۝

অর্থ : প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অত্যাসন্ন এবং চাঁদ বিদীর্ন হয়ে গেছে। আর তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং বলে (এতো) চিরাচরিত যাদু। আর তারা প্রত্যাখান করেছে এবং নিজেদের কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে। অথচ প্রত্যেক আদেশ যথা সময়ে কার্যকর হয়ে থাকে। আর তাদের কাছে এমন কিছু সংবাদ পৌঁছেছে যাতে কঠোর হুশিয়ারী ছিল। (সূরা কামার, ২-৫)

হাদিস শরীফেও এই মো'জেযার কথা বর্নিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে- "মক্কার কাফেররা তাঁর (সা.)-এর কাছ থেকে কোন মো'জেযা দেখতে চাচ্ছিল। তখন তিনি (সা.) তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখান। সুতরাং তারা চাঁদের একটি অংশকে হেরা পাহাড়ের এক অংশে দেখল এবং অপরটিকে অন্য পাশে দেখতে পেল।" (বুখারী ও মুসলিম)

অপর একটি হাদিসে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, " আমরা আঁ-হযরত (সা.)-এর সাথে মীনাতে অবস্থান করছিলাম তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার পর আঁ-হযরত (সা.) বললেন, দেখ এবং সাক্ষী থাক। চাঁদের এক টুকরো পাহাড়ের উপরে ছিল এবং এক টুকরো ছিল নিচে। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়াও হাদিস এবং সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে 'শাক্কুল কামারের' ব্যাপারে অনেক বর্ননা পাওয়া যায়। খালি চোখে দেখা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি প্রাকৃতিক নিয়মের লংঘনে ঘটেছিল কিনা তা বলা মুশকিল। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণে সন্দেহাতীত ভাবে সত্য সাব্যস্ত ঘটনা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ঐশী গুপ্ততত্ত্ব ও প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে বা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে এরূপ দাবি কেউ করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথাও কল্পনা করা যায়না বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল আর পৃথিবীর কোনো মান মন্দিরে তা ধরা পড়লো না বা রেকর্ড ভুক্ত হলো না, কিংবা ইতিহাসের পাতায় তা লিপিবদ্ধ হলো না। কিন্তু দেখা যায় বিশ্বস্ত হাদিসের গ্রন্থ বুখারি ও মুসলিম শরিফেও এই ঘটনার বর্ননা রয়েছে। বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদিসবেত্তাগণও একের পর এক ক্রমাগত ভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় এরূপ অস্বাভাবিক ধরনের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল। কুরআনের তফসীরকারকদের মধ্যে অনেকেই যেমন ইমাম রাযী এই ঘটনার জটিলতা দেখে বলেছেন, এই ঘটনাটি একটি চন্দ্রগ্রহণ ছিল । ইমাম গাযযালি ও শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ এই মতের সমর্থনে বলেন, "চন্দ্র আসলে দ্বিখণ্ডিত হয়নি, তবে আল্লাহ্ তা'লা এমনই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন যে, চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল।" *[সূত্র: সিরাতে খাতামান্ নাবিঈন,হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম এ (রা.)]*

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) ও শাহ আব্দুল আযীযের মতেও এটা ছিল এক বিশেষ ধরনের চন্দ্রগ্রহণ। অবিশ্বাসীরা যখন মহানবী (সা.) কে বার বার অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য পিড়াপিড়ি করছিল, তখন মহানবী (সা.) আল্লাহর ইচ্ছায় মোজে'যা স্বরূপ এরূপ ঘটনার অবতারণা করেছিলেন। এটা মহানবী (সা.)-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের দিব্যদর্শন বা কাশ্‌ফ ছিল, যেমনটি ঘটেছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সময়। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি জ্যান্ত সাপের মত হয়ে যাওয়াটাও ছিল এক উচ্চমার্গের দিব্যদর্শন। যার প্রভাব-বলয়ে ফেরাউনের যাদুকরদের অন্তর্ভুক্ত রাখায় তারাও লাঠিকে জ্যান্ত সাপ রূপে দেখেছিল। নবীগণের আত্মিক প্রভাবেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই মো'জেযাকে যদি বাহ্যিকভাবে ঘটেছিল বলে ধরা হয় তাহলেও ধরে নেয়া যায়। বরং এতে কোন প্রকার আপত্তি থাকতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লার কুদরত এতই অসীম যার অতি সামান্য অংশেও মানুষের দৃষ্টি পৌঁছাতে পারেনা।

১৯৬৮ সনের ঘটনা, দক্ষিন আমেরিকার দেশ লাপ্‌লাটা-তে একটি নক্ষত্রকে দু-টুকরো হতে দেখা যায়। সেই নক্ষত্রটির নাম ছিল নোভা পিকটরিস্ (NOVA PICTORIS)। দক্ষিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জুনসবার্গও এই ঘটনার সত্যায়ন করেছে এবং বিজ্ঞানীরা এও বলে থাকেন যে, এরূপ ঘটনাও অসম্ভব নয় যে, এর পূর্বেও কোন নক্ষত্র দু-টুকরো হয়েছিল। (হিন্দুস্তান টাইমস্, দিল্লি, ২৯ এপ্রিল ১৯৬৮)। সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ও খোদা তা'লার নিদর্শনের অধীনে চাঁদের কোন অংশ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে একত্রে মিলে গিয়েছিল। এবং কোন বিজ্ঞানীও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা এটাই যে, চন্দ্র ছিল আরবদের জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক। যেমন সূর্য পারস্য জাতির প্রতীক। চাঁদ বলতে আরবের বাদশাহ্‌দের যুগকেই বোঝানো হয় এবং চাঁদের এই ব্যাখ্যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)স্বয়ং করেছেন। (খলিফাতুল মসীহ রাবে রাহেঃ-এর উর্দূ অনুবাদকৃত কুরআনের সূরা কামারের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এছাড়া আরো একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, খায়বারের ইহুদী নেতা ইব্‌নে আখতাবের কন্যা হযরত সাফিয়া (রা.) যখন তার পিতার কাছে আপন স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি তার কোলে চন্দ্র পতিত হতে দেখেছেন, তখন পিতা কন্যাকে সজোড়ে চপেটাঘাত করে বলল, "তুই কি সমগ্র আরবের অধিপতিকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিস ?" খায়বার বিজয়ের পর মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত সাফিয়া (রা.)-র বিয়ের মাধ্যমে এই স্বপ্ন তার বাস্তব রুপ পায়। (জুরকানি ও উসদুল গাব্বা)। এই ঘটনাটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ ছিল আরবের ক্ষমতা ও রাজত্বের প্রতীক। সুতরাং 'শাক্কুল কামার' এর অর্থ এটিই হয় যে, কুরাইশদের ক্ষমতা বিলুপ্তি ও ধ্বংসের ক্ষণে উপস্থিত হয়ে গিয়েছে এবং তারই স্থলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ আসন্ন। যখন মক্কার কুরাইশরা তাঁর (সা.) থেকে মো'জেযা দেখার দাবী করছিল তখন খোদা তা'লা তাদের দৃষ্টিতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মাধ্যমে এই উত্তর প্রদান করেছিলেন যে, 'তোমরা মো'জেযা দেখতে চাচ্ছ? আর এদিকে তোমাদের মৃত্যুর ঘন্টা বাজছে। অতঃপর কুরআন শরীফেও এই নিদর্শনের বর্ণনা এই শব্দের মাধ্যমে এসেছে যে, "ইক্‌তারাবাতিস্ সা'আতু" অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস সন্নিকটে। প্রকৃতপক্ষে 'শাক্কুল কামার' মো'জেযার মূল উদ্দেশ্য এটিই ছিল যে, মক্কার কাফেরদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে এবং মক্কার রাজত্ব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের ছায়াতলে আসবে। একই সাথে এটিও প্রমাণিত হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য সত্যই আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত রসূল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

আমার জামেয়াতে আসার অনুভূতি

মুহাম্মদ সামিউল ইসলাম
ছাত্র [১ম বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ছোট বেলা থেকেই মা-বাবা, ভাই-বোন পরিবারের সকলেরই ইচ্ছা আমাকে জামেয়াতে পড়াবেন। এতে আমার বড় ভাইয়ের আগ্রহই বেশী ছিল। কেননা তিনিও একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী। ছোট বেলা থেকেই জামেয়া কথাটি আমার মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। যতই বড় হতে থাকি বিষয়টি আমার মনে ততই বিস্তার লাভ করতে থাকে। কোন এক সময় কুরআন শরীফ পড়তে গিয়ে সূরা তওবার ১২৩ নম্বর আয়াতটি আমার চোখে পড়ে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থ : অতএব তাদের প্রত্যেক জামাত থেকে একটি করে দল (কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে) কেন বের হয় না যাতে তারা ধর্মে অধিক বুৎপত্তি লাভ করে এবং নিজ জাতির কাছে ফিরে গিয়ে তারা তাদেরকে সতর্ক করে, যেন তারা (ধ্বংস থেকে) রক্ষা পায়।"

আয়াতটি পড়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। কি করি, কি করি। পরে আমার বড় ভাইয়ের কাছে জানতে চাই যে, ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি বলেছেন? তিনি তখন আমাকে মালফুযাত থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি শুনালেন। যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'কেউ যদি নাযাত (পরিত্রান) এবং পবিত্র জীবন লাভ করতে চায় অথবা চিরস্থায়ী জীবনের প্রত্যাশি হয় তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌র জন্য জীবন উৎসর্গ করে'। (মালফুযাত প্রথম খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

এটি শুনে আমার স্পৃহা আরও বেড়ে গেল। এরপর আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকি। এস এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে আমি জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করি এবং এর কিছু দিন পর আমাকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। অতঃপর জামেয়া আহমদীয়াতে এসে চার দিন ব্যাপি ভর্তি পরীক্ষা দেই এবং আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আমাদের প্রাণ প্রিয় হুজুরের অনুমোদনে আমি জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করি।

এরপর বাড়ি থেকে জামেয়ায় চলে আসি। যথারীতি ক্লাস শুরু হয় এবং নিয়মিত ক্লাস করতে থাকি। প্রথম দিকে কিছুটা কষ্ট হলেও আল্লাহ্ তা'লার রহমতে ধীরে ধীরে সেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। আলহাম্‌দুলিল্লাহ্। জামেয়া এমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেখানে এত সুন্দর নিয়ম-কানুন ও সময়ানুবর্তিতা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পাওয়া দুস্কর। আমাদের বড় ভাইদের সাথে থাকতে এতই ভালো লাগে যে, বাড়ির কথা মনেই পড়ে না। আর তাদের আচার- আচরণ, স্নেহ-ভালোবাসা সত্যিই অতুলনীয়। জামেয়ার পরিবেশ, শিক্ষকদের স্নেহ ভালোবাসা এতই সুমধুর যে, মনে হয় তারাই যেন আমাদের বাবা-মায়ের অভাব পূরন করছেন। তারা আমাদেরকে নিজের সন্তানের মত আদর, স্নেহ, মমতা দিয়ে লেখা পড়া শিখিয়ে থাকেন। জামেয়াতে এসে আমার এতই ভালো লাগছে যে আমি তা বলে বুঝাতে পারবো না। এখানকার পরিবেশ, সবার পারস্পরিক সম্পর্ক এতই সুমধুর যা নিজে অবলোকন না করলে বোঝা যায় না কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঐশী প্রতিষ্ঠান কে নিজ হাতে বরকত দান করেন। পরিশেষে একটি কথাই বলতে চাই, আল্লাহ্ তা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করার মতো শান্তি পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর ঐশী জামাতের উত্তম সেবক হওয়ার তৌফিক দান করুন। (আমিন)।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বাৎসরিক কার্যক্রম

মোহাম্মদ মোমিন হোসেন
ছাত্র [৬ষ্ঠ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

জামেয়া আহমদীয়া একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় জ্ঞানের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য জাগতিক জ্ঞানেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এটি এমন একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার ভিত্তি যুগ ইমাম হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রেখেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর পৃথিবীর অন্যান্য জামেয়ার ন্যায় এই বাংলাদেশ জামেয়ারও সকল কার্যক্রম সরাসরি যুগ খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। তদসঙ্গে জামেয়ার প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত নিবিড় ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। নিম্নে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বাৎসরিক কার্যক্রম সম্মন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি–

প্রতি বছর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে দুটি সেমিস্টার হয়ে থাকে। প্রথম সেমিস্টারের ব্যাপ্তিকাল থাকে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর অবধি। সেমিস্টারের শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে ক্লাস চলতে থাকে। এবং প্রত্যহ আটটি করে ক্লাস হয়ে থাকে। ধারাবাহিক ক্লাসের মাঝে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। জামেয়ার নিজস্ব মাঠ না থাকার কারণে সপ্তাহে দু' দিন ছাত্ররা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে খেলতে যায়। ছাত্রদের আউট ডোরের পাশাপাশি জামেয়াতে ইনডোর খেলাধূলারও সুব্যবস্থা রয়েছে।

এই প্রথম সেমিস্টারের শুরুতেই ছাত্রদের মেধা, মন ও মনন বিকাশের পাশাপাশি শারিরীকভাবে সুস্থ থাকার প্রয়াসে জামেয়ার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলাধূলা চলতে থাকে। যাতে বিভিন্ন একক এবং দলীয় খেলাধূলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেমন- ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, রশি টানা-টানি, টেবিলটেনিস, গোলক নিক্ষেপ, শুটিং, দৌড় ও ডার্ট প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। খেলাধূলার পাশাপাশি ছাত্রদের মেধার প্রখরতা বৃদ্ধি এবং ধীঃশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলমি প্রতিযোগিতা যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা (বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজি), রচনা লিখন (বাংলা, উর্দূ ও ইংরেজি), কুইজ প্রতিযোগিতা (রুহানী খাযায়েন) ইত্যাদি বিভিন্ন নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে জামেয়ার ক্লাস ও অন্যান্য কার্যক্রম চলতে থাকার পর পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটি হয়ে থাকে। যে ছুটিতে ছাত্ররা নিজ নিজ বাসায় চলে যায়। এই ছুটি শুরু হয় ছয় মাইল দূরত্বের মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ছাত্ররা মিনি ম্যারাথনে বাধ্যতামূলকভাবে অংশগ্রহন করার পরই ছুটিতে যেতে পারে।

আবার এই সেমিস্টারেই দশ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যার দূরত্ব বকশীবাজার থেকে নিয়ে মিরপুর চিড়িয়াখানা পর্যন্ত হয়ে থাকে । এতে ছাত্ররা অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে অংশগ্রহন করে থাকে।

প্রতিবছর একটি বাৎসরিক বনভোজন হয়ে থাকে যাতে জামেয়ার সকল শিক্ষক ও ছাত্ররা অংশগ্রহন করে। এই বনভোজনে স্পট হিসেবে বেছে নেয়া হয় বিভিন্ন শিক্ষামূলক, ঐতিহাসিক এবং সুন্দর ও মনোরম স্থান। বরাবরই ছাত্ররা এই বনভোজনের জন্য অধীর আগ্রহে থাকে। কেননা, বনভোজন অত্যন্ত আনন্দের হয়ে থাকে। সেমিস্টার শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার ফলাফল হুযুর (আই.) কতৃক অনুমোদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পরীক্ষার পর সাধারনত জামেয়া কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে।

ছুটির পর থেকে দ্বিতীয় সেমিস্টার শুরু হয়ে যায়। যার ব্যাপ্তিকাল জানুয়ারী-জুন মাস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। পূর্বের মত আবার ধারাবাহিকভাবে ক্লাস শুরু হয়। সেমিস্টার শুরুর কিছুদিন পরই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর শুরুর দিকে জলসার আমেজ শুরু হয়ে যায়। ছাত্ররা জলসায় বিভিন্ন বিভাগে অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে থাকে। জলসার অনতিপর বার্ষিক নৈশভোজের আয়োজন করা হয় যাতে অত্যন্ত সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা থাকে। এই নৈশভোজে হুযুর আকদাস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন এবং জামাতের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। নৈশভোজের পূর্বে হুযুর আকদাস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সামনে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এছাড়া জামেয়ার প্রিন্সিপাল সাহেবও বক্তব্য রাখেন। এরপর হুযুর আকদাস (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি বার্ষিক ক্রিড়া ও তালিমি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেন।

জলসার পর জামেয়ার ক্লাস আবার পুরোদমে চলতে থাকে।

ধারাবাহিক ক্লাসের পাশাপাশি বিভিন্ন জামাতী দিবস যেমন মসীহ মাওউদ (আঃ) দিবস, খেলাফত দিবস, মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস এবং সীরাতুন্নবী (সা.) দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভির্যের সাথে উদযাপন করা হয়। আর এসব দিবসে জামেয়ার শিক্ষকগণের পাশাপাশি ছাত্ররাও গবেষণা ও প্রস্তুতিসহ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

এসব জামাতী ও ধর্মীয় দিবসের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, শোক দিবস ও বিজয় দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এসব দিবস সমূহে জামেয়াতে যথাসম্ভব ছুটি থাকে। এসব জাতীয় দিবস সমূহে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া পহেলা বৈশাখেও জামেয়া ছুটি থাকে। এদিন সকালে ছাত্রদের জন্য বাঙ্গালীর ঐতিহ্যবাহী খাবার পান্তা-ইলিশের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

পড়াশোনায় একঘেয়েমি ও বিরক্তিভাব দূরীকরণ, মানসিক আনন্দ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি এবং জাগতিক জ্ঞানার্জন ও ভ্রমণের জন্য জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্রদের জন্য প্রতিবছর মার্চ মাসে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই শিক্ষাসফরে চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের ছাত্ররা (দরজায়ে রাবেয়া ও খামেসা) এই সফরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। এ সফরের যাবতীয় বিষয়ে নিগরান হিসেবে তিন জন শিক্ষক থাকেন। দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী, আকর্ষনীয় ও দর্শনীয় স্থান এবং মনোমুগ্ধকর ও মনোহরী স্থানে ছাত্রদেরকে এই শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন– পার্বত্য চট্রগ্রামের বান্দবান, রাঙ্গামাটি, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভুমি ও মনোহরী কক্সবাজার, কুয়াকাটা, সিলেটের চা-বাগান প্রভৃতি। সবসময়ই ছাত্ররা শিক্ষাসফরের জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতে থাকে। কেননা, চার দিন ব্যাপী এই শিক্ষাসফর ছাত্রদের জন্য আনন্দ-বিনোদনের এক বিরাট উপলক্ষ হয়ে থাকে। অনুরুপভাবে প্রতিবছর জামেয়ার শেষ বর্ষের ছাত্ররা (শাহেদ) হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পবিত্র জন্মভূমি, দারুল আমান কাদিয়ান সফরে গিয়ে থাকেন। এই সফর ছাত্রদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে জন্য অনেক গুরুত্ব রাখে। প্রত্যেক ছাত্র অধীর আগ্রহে থাকে কেননা এই সুযোগ ৭ বছরে একবারই আসে। এই সফরে কাদিয়ানের মুকাদ্দাস মাকামাত (পবিত্র স্থানসমূহ) এর পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থান যেমন- কলকাতা, দিল্লী, আগরার তাজমহল, লাহোর, লুধিয়ানা, হুশিয়ারপূর, গোল্ডেন টেম্পল (স্বর্ণ মন্দির), কাশ্মীর, শিমলা, অমৃতসর এবং ডালহৌসি প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানসমূহ সুযোগ ও সুবিধামত ভ্রমন করানো হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় সেমিস্টারের শেষে অর্থাৎ মে-জুনে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তারা পরবর্তী ক্লাসে পদার্পণের সৌভাগ্য লাভ করে। সাধারণত পাঠ্যবছরের শেষে অর্থাৎ জুন মাসে জামেয়ার নতুন ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রতিবছর ছাত্রদের ওয়াকফে আরজী করতে হয়। দুই বা ততোধিক ছাত্র এক সাথে কোন এক জামাতে গিয়ে ওয়াকফে আরজী করে থাকে। দরজায়ে সাদেসার অর্থাৎ শেষ বর্ষের ছাত্রদের শাহেদ ফাইনাল পরীক্ষা মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কাদিয়ান জামেয়ার প্রিন্সিপাল সাহেবের দায়িত্বে প্রস্তুত করা হয় এবং উত্তরপত্রও কাদিয়ান জামেয়া যাচাই করে বাংলাদেশে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে জুন মাসে যারা শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করে থাকে তাদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবং তাদের সম্মানে ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যাতে শাহেদ কোর্স সম্পন্নকারী ছাত্রদের অভিভাবকদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। এর পর জামেয়াতে পবিত্র রমজান, ঈদুল ফিতর ও গ্রীস্মের লম্বা ছুটি শুরু হয়। অনন্তর এভাবে পুনরায় নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এক নব উদ্যমে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ছকে বাঁধা বাৎসরিক কার্যক্রমের যাত্রা আরম্ভ হয়।

জামেয়ার দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড

সফিক আহমদ চৌধুরী
ছাত্র [৩য় বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

একটি চারা গাছ যেভাবে ছোট থেকে ধীরে ধীরে একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয় ঠিক সেভাবেই জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিনিয়ত এর মান উন্নত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

জামেয়ার প্রত্যেকটি কার্যক্রম যুগ খলীফার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। জামেয়ার দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্বন্ধে অনেকেরই কিছু জানা নেই আবার অনেকের কিছু ভুল ধারণাও রয়েছে। তাই সকলের জ্ঞাতার্থে তা নিম্নে তুলে ধরা হল: ভোরের পাখিরা জেগে উঠার আগেই জামেয়ার ছাত্ররা জেগে উঠে। কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে,

সুপারগণ এমনকি প্রিন্সিপাল সাহেব নিজেও ছাত্রদের ফজরের নামাযের নিগরানী করেন। ফজরের নামায পড়ে ছাত্ররা প্রায় আড়াই কি.মি. হাটতে যায় এবং এর নিগরানী করা হয়। তারপর তারা ব্যক্তিগত কুরআন তেলাওয়াত করে এবং সকাল ৭ টা থেকে সাড়ে ৭ টার মধ্যে সবাই নাস্তা সেরে ফেলে। উল্লেখ্য, ডাইনিং এর খাবারের বিষয় তত্ত্বাবধান করার জন্য ছাত্রদের মধ্য হতে একজন ম্যাচ ম্যানেজার এবং দুজন সহকারী ম্যাচ ম্যানেজার নির্বাচন করা হয় যারা খাবার পরিবেশন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নাস্তা করার পর কেউ ক্লাসের পড়াশোনা করে আবার কেউ গোসল করে ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়। অতঃপর ৭.৫০ মিনিটে সবাই এসেম্বলীর জন্য জড়ো হয় এবং তাতে কুরআন

জামেয়ার ক্লাসগুলোর নাম নিম্নরূপ :

দরজায়ে মুমাহেদা	- প্রথম বর্ষ
দরজায়ে উলা	- দ্বিতীয় বর্ষ
দরজায়ে সানীয়া	- তৃতীয় বর্ষ
দরজায়ে সালেসা	- চতুর্থ বর্ষ
দরজায়ে রাবেয়া	- পঞ্চম বর্ষ
দরজায়ে খামেসা	- ষষ্ঠ বর্ষ
দরজায়ে সাদেসা	- সপ্তম বর্ষ

প্রতিদিন ৪০ মিনিট করে মোট আটটি ক্লাস হয় এবং চার ক্লাসের পর ২০ মিনিটের টিফিন টাইম থাকে। বৃহস্পতিবারে চার ক্লাস হয়, ক্লাসের পর সেমিনার ক্লাস হয় যেখানে মসীহ মাওউদ (আ.) এর বিভিন্ন পুস্তক অথবা বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ছাত্ররা পালাক্রমে নির্ধারিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে। এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে হুযূর (আই.) এর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী ছাত্রদেরকে সাপ্তাহিক রোযা রাখতে হয়। শুক্রবারে ক্লাস ছুটি থাকে এবং প্রত্যেক শুক্রবার ভোরে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে হয়। ক্লাস শেষে ছাত্ররা যোহরের নামাজ পড়তে জামেয়ার হলরুমে চলে যায়। উল্লেখ্য, জামেয়ার দৈনন্দিন কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রাখতে, হুযুর (আই.) এর অনুমতিক্রমে যোহর এবং এশার নামায জামেয়ার হলরুমে বাজামাত পড়া হয় আর বাকি তিন ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়েই পড়তে হয়। নামাজ শেষে সবাই খাবার খেতে ডাইনিং-এ চলে যায়। খাবারের পর থেকে নামাজে আসর পর্যন্ত ছাত্রদের কেউ ব্যক্তিগত পড়ালেখা করে, কেউ টেবিল টেনিস খেলে, কেউ সংবাদপত্র পড়ে, কেউ টি.ভি-তে এম.টি.এ অথবা নিউজ দেখে আবার কেউ বিশ্রাম নেয়। এছাড়াও সপ্তাহে দুদিন ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে ছাত্রদের বাইরে গিয়ে খেলতে হয়। তারপর সময়মত আসরের নামাজে সবাই মসজিদে চলে যায়। নামাজ শেষে অনেকে বাহিরে ঘুরতে যায় আবার অনেকে ইনডোর গেম খেলে থাকে। তবে মাগরিবের পূর্বেই সবাইকে হোস্টেলে ফিরে আসতে হয়। তারপর সবাই নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে চলে যায় এবং নামাজ শেষে হোস্টেলে ছাত্রদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের উপস্থিতি নেওয়া হয়। মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত ফ্রি টাইম থাকে এবং ঐ সময়ে ছাত্ররা জামেয়ার লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে অথবা নিজের ব্যক্তিগত কাজ করতে পারে। এ সময় ছাত্ররা গ্রুপ স্টাডিও করে থাকে আবার কম্পিউটারেও বিভিন্ন কাজ শিখে থাকে। কিন্তু, হুযূর (আই.) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সন্ধ্যার পর কোন ছাত্র গেটের বাইরে বের হতে পারে না। এরপর যথাসময়ে সবাই এশার নামাজে চলে যায় এবং নামায শেষে রাতের খাবার খেতে যায়। খাওয়া শেষে সবাইকে নির্দিষ্ট দুই ঘন্টা বাধ্যতামূলক ‘স্টাডি টাইম’-এ পড়ালেখা করতে হয় এবং হোস্টেল টিউটরগণ প্রত্যেক রুমে রুমে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোন ছাত্রের পড়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা হলে তা সমাধান করে দেন। স্টাডি টাইম শেষে ছাত্ররা ফ্রেশ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং এগারটার মধ্যে লাইট নিভিয়ে দেয়া হয়। এরপর ছাত্ররা ঘুমিয়ে পড়ে এবং পরদিন ভোর থেকে একই নিয়মে দৈনিক কার্যক্রম চলতে থাকে। উল্লেখ্য, হোস্টেল সুপারের প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্রদের মধ্য থেকে তিন জনকে নির্বাচন করা হয় যারা ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় তত্ত্বাবধায়ন করে।

জামেয়াতে শুধুমাত্র পড়ালেখার দিকটাই দেখা হয় না বরং বাহ্যিক আচার-আচরণ ও তরবীয়তের ব্যপারেও খুব ভালভাবে দৃষ্টি রাখা হয়। এখানে ছাত্রদেরকে আর্মিদের মত প্রশিক্ষণ দিয়ে একটা নিয়মতান্ত্রিক জীবন গড়ার শিক্ষা দেয়া হয়। ছাত্রদের পড়ালেখার পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনেরও ব্যবস্থা করা হয়। জামেয়ার শিক্ষকগণ ছাত্রদেরকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন এবং তাদের নিগরানী করেন। জামেয়া থেকে প্রত্যেক ছাত্রকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ তা’লা করুন, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ যেন উত্তরোত্তর উন্নতি করে এবং এ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। আমীন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিবেদন-২০১৬

মাসুদ আহমদ
ছাত্র [৬ষ্ঠ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

শরীরচর্চা বা খেলাধুলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য অংশ। মানব জীবনে সুস্থ বিনোদনের এক অন্যতম মাধ্যম হল খেলাধুলা। খেলাধুলা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে। দেহ ও মনের কল্যাণ সাধনে এর কোন জুড়ি নেই। খেলাধুলা মানুষকে অনেক গোপন ও প্রকাশ্য পাপ থেকেও রক্ষা করে। রসূল করীম (সা.) বলেছেন, একজন স্বাস্থ্যবান মু'মিন একজন দূর্বল মু'মিন অপেক্ষা উত্তম। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা প্রসঙ্গে আমাদের যুগ খলিফা সকল আহমদীকে বিশেষভাবে সকল ওয়াকফে জিন্দেগী ও জামেয়ার ছাত্রদেরকে বিভিন্ন সময় উপদেশ দিয়েছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক জামেয়ার সিলেবাসকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও প্রায়োগিক করে তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। জামেয়া কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়নে যথাসাধ্য তৎপরতা প্রদর্শন করে থাকে। এবার মূল পর্বে আসা যাক। আমাদের খেলাধুলা এবং শরীরচর্চাকে দুই ভাগে বর্ণনা করছি। প্রথমত: দৈনন্দিন খেলাধুলা ও শরীর চর্চা দ্বিতীয়ত: বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

দৈনন্দিন খেলাধুলা ও শরীর চর্চার অংশ হিসেবে আমরা প্রতিদিন ভোরে ফজর নামাযের পরে প্রায় ২ কিলোমিটার হেঁটে থাকি। এছাড়া ইনডোর গেম্‌স হিসেবে আমরা টেবিল টেনিস, ক্যারাম, মিনি ফুটবল, ডার্ট ইত্যাদি খেলা খেলে থাকি। উল্লেখ্য আমাদের নিজস্ব কোন মাঠ না থাকায় আমরা ইনডোর গেমগুলোই বেশি খেলে থাকি। এছাড়া সপ্তাহে দু'দিন আমরা আমাদের জামেয়ার বাইরে গিয়ে বড় পরিসরে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে থাকি। এটি আমাদের সাপ্তাহিক খেলাধুলার অংশ।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

জামেয়ার রুটিন অনুযায়ী প্রতি বছর ৩ দিন ব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যা ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের কাছে অনেক আকর্ষণীয় একটি উপলক্ষ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ক্রীড়া শিক্ষক, সহকারী ক্রীড়া শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিবিড় তত্ত্বাবধানে, খেলাধুলা বিভাগের ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দলীয় অধিনায়কদের স্বত:স্ফূর্ত সহযোগীতার ফলেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার সকল ইভেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচলনা করা সহজ হয়ে ওঠে। সকল প্রকার দলীয় খেলাগুলো পরিচালনার জন্য জামেয়ার সকল ছাত্রদেরকে মোট ৪টি দলে ভাগ করা হয়। দলগুলো হলো আমানত, রাফাকাত,

সাদাকাত ও শুজাআত। প্রতিটি দলে সিনিয়র ক্লাস থেকে একজন অধিনায়ক ও একজন সহকারী অধিনায়ক নির্বাচিত হন। অধিনায়ক তার দলের অধীনস্থদেরকে পরিচালনা করে।

এই চারটি দলের মাঝে আন্ত:দলীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাগুলো লীগ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রতিটি দল একে অপরের সাথে খেলে। দলীয় খেলাগুলোর মধ্যে যে সমস্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো হল : ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, রশি টানাটানি, ৪০০ মিটার রিলে দৌড়। এছাড়া একক ও দ্বৈত খেলার মাঝে ছিল ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, তিন পায়ে দৌড়, টেবিল টেনিস (একক ও দ্বৈত), গোলক নিক্ষেপ, নিশানা ভেদ ও ডার্ট।

এসব খেলার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা হলো রশি

টানাটানি। যেখানে দলের সকল সদস্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

এ সমস্ত খেলা ছাড়াও বার্ষিক মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার। সকল ছাত্রদেরকে এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। এছাড়া বার্ষিক ১০ মাইল হাঁটা প্রতিযোগিতা থেকে অনুষ্ঠিত হয় যা বকশি বাজারস্থ দারুত তবলিগ মাঠ থেকে মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অত্যন্ত টানটান উত্তেজনা, উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য বিজয়ী ও বিজিতদেরকে আগামী কেন্দ্রীয় জলসার পরে হুযুরের সম্মানিত প্রতিনিধি সাহেবের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে পুরষ্কৃত করা হবে। সেখানে জামেয়ার গভর্ণিং বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ ন্যাশনাল আমীর সাহেব এবং কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্। সর্বোপরি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সমস্ত জামেয়াতে এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

শিক্ষা সফর-২০১৬

সজীব আহমদ
ছাত্র [৬ষ্ঠ বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমি তোমাদের পোড়ামাটির শহরে প্রাণ খুজে পাই নাকো আর
মন চায় এই বেড়াজাল থেকে উড়ে যাই সমুদ্রের পানে
মন চায় বেয়ে উঠি ছোট-বড় পাহাড়ের চূড়ায়,
যেখানে হৃদয়ে মিলবে সুগভীর প্রশান্তি।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করানো হয়। আর এমন সব বিষয়ও রয়েছে যা জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তাই পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে রয়েছে শিক্ষার পরিপূর্ণতা। জীবনের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক যেমন নিবিড় ঠিক তেমনি শিক্ষার সাথে সফরের সম্পর্কও। তাই ভ্রমণ বা সফরকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বলা যেতে পারে। শিক্ষার প্রতিটি বিষয়কে বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য সফর বা ভ্রমণ খুব জরুরী। আর অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে ছাত্ররা সবসময় পড়ালেখা এবং ছকে বাঁধা কর্মসূচীতে থাকার ফলে তাদের মাঝে একধরনের একঘেয়েমী ভাব চলে আসে। তাই একঘেয়েমী ভাব দূর করার জন্য শিক্ষা সফর অন্যতম ভূমিকা পালন করে। স্বভাবগত বৈশিষ্টের কারণে মানুষ ভ্রমণের প্রতি দূর্বল। আদিকাল থেকে প্রকৃতির জ্ঞান অন্বেষণের জন্য মানুষ সর্বদা অতিক্রম করেছে নিজস্ব গন্ডি। সৃষ্টির রহস্য, মানুষ ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দর্শনের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজেকে জানে তেমনিভাবে জ্ঞানও লাভ করে।

জামেয়াতে প্রতি বছর চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে গিয়ে থাকে। আমরা যেহেতু পঞ্চম বর্ষের ছাত্র ছিলাম তাই এটি আমাদের জন্য দ্বিতীয় শিক্ষা সফর ছিল। এবার আমাদের শিক্ষা সফরের জন্য প্রকৃতির অনন্য লীলাভূমি বান্দরবান ও রাঙামাটি নির্ধারণ করা হয়। আমাদের দুই ক্লাসের ছাত্ররা এবং দুই জন শিক্ষকসহ সর্বমোট চৌদ্দ জনের কাফেলা ছিল। এখন ভ্রমণ বৃত্তান্তে আসা যাক–

সকল জল্পনা-কল্পনা শেষে আমাদের শিক্ষা সফরে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল। ৩০শে মার্চ, ২০১৬, রাত নয়টায় রিকশা করে বকশীবাজার থেকে শাহবাগ পৌঁছাই। ঠিক দশটায় আমাদের নির্ধারিত বাস রাঙামাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পরবর্তী দিনকে কাজে লাগানোর চিন্তা করে আমরা বাসে উঠেই লম্বা এক ঘুম দেই। রাত এক ঘটিকায় আমরা যাত্রা বিরতির জন্য কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পৌছাই।

সেখানে আমরা হাল্কা নাস্তা সেরে নেই। এরপর বাস আবার রাঙামাটির উদ্দেশ্যে তার যাত্রা শুরু করে।

হঠাৎ বাসের ঝাকুনিতে ঘুম ভাঙল। বাহিরে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বাস পাহাড়ের উচু নিচু টিলার ভিতর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। শুভ্র মেঘের ভেলা দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলা। এরই মাঝে সুর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করি। কবির ভাষায় :

মেঘ ছুটিল বায়ু বহিল
নির্বাক সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিল
অন্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল
মাঝি মাল্লাগণ জাগিয়া উঠিল
লাল আভা ছড়াইতে লাগিল
অবশেষে আকাশে সূর্যোদয় হইল।

কাপ্তাই রাস্তার পাশেই অবস্থিত বিজিবি পরিচালিত পেনোরোমা রেস্তোরা। এর সামনেই আমরা নেমে পরি। আমাদের পুরো সফরের মূলকেন্দ্র ছিল এই রিসোর্টটি। আমরা এখান থেকে

একজন আহমদী মেজর জনাব মাহমুদ সাহেবের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যাই আবার রাতে সেখানেই ফিরে আসি। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব বশীরুর রহমান সাহেব ও জনাব মাসুম আহমদ সাহেব আমাদের সফরটাকে আরো আনন্দময় করে তুলেন। আমরা সকালের নাস্তা করেই সেখান থেকে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় করে কাপ্তাই লেকে ঘুরতে বের হই।

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলানিকেতন কাপ্তাই হ্রদ। উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত, পাহাড়ী ঝর্ণাধারা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, অথৈ পানি আর সবুজের সমারোহ, গাঢ় সবুজ বন আর উপজাতিদের জীবনধারা কাপ্তাই লেকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন করা। যাত্রাপথে আমরা 'চিৎমরম' নামক স্থানে নামি। সেটি মূলত একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। তাদের বৌদ্ধ বিহার ঘুরে দেখি এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাথে কথা বলি আর এই সুযোগে তাদের সাথে কিছু ছবি তুলে নেই। পুনরায় আমরা ইঞ্জিল চালিত নৌকায় করে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। অতঃপর সেখানে পৌছে আমরা দীর্ঘ কয়েকঘন্টা পুরো বিদ্যুতকেন্দ্র ঘুরে দেখি। বিজিবির তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে যে সমস্ত জিনিস সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত তাও আমরা দেখার সুযোগ লাভ করি। এরপর আমরা পায়ে হেটে কর্ণফুলি বাঁধে যাই। ১৯৫৩ সালে এই কাগজকলটি কাপ্তাইয়ে ত্রিশ হাজার শ্রমিক নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে যা পরবর্তীতে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাগজমিলে রূপান্তরিত হয়। সেখানকার একজন কর্মকর্তা আমাদেরকে পুরো মিলটি ঘুরে দেখান। এরপর আমরা চা বাগানে গিয়ে কিছু সময় কাটাই ও কয়েকটি গ্রুপ ছবি তুলে নেই। সারাদিন ঘুরার পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুমের রাজ্যে চলে যাই।

১লা এপ্রিল, ২০১৬। ফজরের আযানের পর ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ি ও নাস্তা খেয়ে নেই। আমাদের জন্য পূর্ব থেকেই একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করা ছিল। সকাল সাতটায় আমরা পাহাড়ের উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে বান্দরবান জেলার নীলগিরির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠলাম, ড্রাইভার সাহেব আমাদেরকে গাড়ি থামিয়ে ভাসমান মেঘের লুকোচুরি খেলার দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিলেন। এ যেন এক অপরূপ সৌন্দর্য! ধোঁয়ার ন্যায় মেঘগুলো ভাসছিল ও পাহাড়ে আঁছড়ে পড়ছিল। অনেক প্রতিক্ষার পর আমরা নীলগিরি পৌঁছলাম। নীলগিরি বান্দরবান জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থানের কারণে সবসময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে। নীলগিরির নীল আকাশ যেন নিজের আঁচল দিয়ে আগলে রেখেছে প্রকৃতির সবটুকু সবুজকে। যেখানে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে চায় সুদূরের নীল আকাশকে। আকাশের দিকে দৃষ্টি বাড়ালেই দেখা মিলে মেঘরাজ্যের। আর রাজ্যের সবটুকু মেঘ প্রকৃতিকে এক শীতল ছোঁয়ায় বেঁধে রাখে। হাত বাড়াতে মনে হয় এক টুকরো সাদা মেঘ জলবিন্দু হয়ে হাতে এসে ধরা দিয়ে গেল। বিশাল নীল আকাশ আর দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা সবুজ পাহাড়ের এমন সমাহার যেন উচাটন মনকে সাহিত্যের জগতে নিয়ে যায়। এরপর আমরা বান্দরবান শহরে দুপুরের খাবার খেতে ফিরে আসি। খাওয়ার পর পথে আমরা মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে কিছু সময় কাটাই। অতঃপর বান্দরবান থেকে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত নীলাচল পাহাড়ের চূড়ায় যাই। যেখান থেকে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের ঢালে কোথাও আঁকাবাকাঁ রাস্তা, কোথাও পাহাড়ি পাড়া আর রূপালি নদীগুলো যেন শিল্পির তুলির কোমল আঁচরে ফুটে ওঠা ছবির ক্যানভাস। নীলাচল পাহাড়ের উপর থেকে এক নজর

দেখা যায় পুরো বান্দরবান শহর। এমন সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে বান্দরবান শহরকে পিছনে রেখে কিছু ছবি তুলে নেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে গাড়িতে সারাদিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা পুনরায় কাপ্তাই রিসোর্টে ফিরে আসি।

পরদিন খুব সকালে নাস্তা করে নৌকা ঘাটে যাই। সেখান থেকে ইঞ্জিল চালিত নৌকায় করে শুভলং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এই ঝর্ণার নির্মল জলধারা পর্যটকদের হৃদয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণ জাগায়। ভরা বর্ষার মৌসুমে শুভলং ঝর্ণার জলধারা প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু থেকে নিচে আছড়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তখন শুষ্ক মৌসুম থাকার কারণে ঝর্ণাটি দেখার সৌভাগ্য হয় নি। জলপথে পাহাড়ের বুক চিরে আঁকাবাঁকা পানিপথে রাঙামাটির অপার সৌন্দর্য চোখে পড়েছে। এখানকার লেক ঝর্ণা বিস্তীর্ণ নীলাকাশ, পাহাড়। সর্বপরি আদিবাসী মানুষের সহজ-সরল জীবন আমাদের হৃদয়কে বিমোহিত করেছে। যেদিকে তাকাই কেবল নজর পড়েছে শুধু পাহাড় আর কাপ্তাই লেকের পানি। বিশাল কাপ্তাই লেকের পুরোটাই যেন অপার মমতায় দু হাত দিয়ে আগলে রেখেছে পাহাড়গুলিকে। হলফ করে বলা যায়, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রত্যেকের হৃদয়কে টানবে। শুভলং বাজারে থেমে আমরা সেখানকার স্থানীয় আনারস খাই যার স্বাদ মনে হলে এখনো আমাদের জিভ ভিজে যায়। এরপর আমরা মাইনীবাজারের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু করি। অবশেষে আমরা দুপুর দুইটা বাজে মাইনীবাজার নামক স্থানে পৌছাই। নৌকা থেকে নেমে আমরা বাজারে ঘুরতে বের হই। প্রায় এক ঘন্টা আমরা পুরো বাজার ঘুরে দেখি। সেখান থেকে দই আর রসমালাই কিনে নেই। অতঃপর ফিরে আসার উদ্দেশ্যে আমরা নৌকায় এসে উঠি। নৌকা ছাড়ার পরপরই আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে রসমালাই ও দই পেট ভরে খাই। দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘন্টা নৌকায় সফর করে শুভলং ঝর্ণা না দেখার কষ্ট নিয়ে আমরা আবার আমাদের রিসোর্টে ফিরে আসি।

৩ এপ্রিল ২০১৬। খুব সকালে আমরা রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রীজ দেখার উদ্দেশ্যে মাইক্রোবাস নিয়ে বের হয়ে যাই। আমাদের স্বপ্ন যেন সত্যিই পূর্ণ হল। শেষ পর্যন্ত আমরা ঝুলন্ত ব্রীজে পৌছে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য অবলোকন করলাম। এরপর আমরা সেখান থেকে রাঙামাটি রাজবিহারে যাই। যেহেতু সে দিন আমাদের ফেরত আসার কথা ছিল তাই দ্রুত রিসোর্টে ফিরে আসি। বিকাল চারটার দিকে ফিরে আসার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

মেজর সাহেব আমাদের বিদায় জানাতে আসেন। মেজর সাহেবের কথা আমরা কখনো ভুলবো না। তাঁর বদৌলতে আমাদের এই সফর আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং কম সময়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলো দেখা সম্ভব হয়েছিল।বাস আসতে খানিকটা দেরী হচ্ছিল। সেই সুযোগে তিনি আমাদেরকে তার অফিসের গাড়ি দিয়ে বিজিবি ক্যাম্প ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করে দেন। অবশেষে আমাদের বাস এসে গেলে অপরূপ সৌন্দর্যের শহর রাঙামাটি বান্দরবানকে বিদায় জানিয়ে আমরা চিরচেনা শহর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই।

ঘুরে এলাম পবিত্রভুমি কাদিয়ান

চৌধুরী মারুফ আহমদ

ছাত্র [৭ম বর্ষ], জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'লা বেশ কয়েকটি স্থানে পৃথিবীব্যাপী ভ্রমন করার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা রুম-এর ৪৩ নম্বর আয়াতে বলেন-

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর'। অন্য এক স্থানে বলেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

অর্থাৎ তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম ও বসবাসের উপযোগী করেছেন। সুতরাং তোমরা তার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমন কর এবং তার রিযিক হতে আহার কর। (সূরা আল মুলক : ১৬)

সর্বপ্রথম আমরা শাহেদ ব্যাচের ছাত্ররা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি আমাদেরকে কাদিয়ান দারুল আমান ভ্রমন করার অনুমতি প্রদান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের জন্মভুমি ত্যাগ করে ভিনদেশ ভ্রমন করলে যেমন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় তেমনি সেই দেশের পরিবেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানা যায়। ভ্রমন করলে শরীর-স্বাস্থ্য ও মন উভয়ই প্রশান্তি লাভ করে। ছাত্রদের শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করার জন্যই জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ সাত বছরের কোর্সে একবার পবিত্রভুমি কাদিয়ান সফরের কর্মসূচি রাখে। বিগত বছরসমূহে কাদিয়ান ভ্রমনের কর্মসূচি মার্চ-এপ্রিল মাসে ছিল। সে সময় প্রচন্ড গরম থাকার কারণে এ বছর কাদিয়ান সফরের কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়। কর্মসূচিতে এই সফর অক্টোবরের ১৫ তারিখে নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে সকলের ভিসা না হওয়ার কারণে তা ১লা নভেম্বর তারিখ রাখা হয়। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে মাওলানা নাসের আহমদ সাহেব এবং মাওলানা মাসুম আহমদ সাহেব সফর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। খোদা তা'লার ফযলে ছাত্রদের সাত জনের মধ্যে পাঁচ জনের ভিসা হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে একজন অনিবার্য কারণবশত যেতে পারেনি। আর একজনের ভিসা হয়নি। তাকে পরবর্তীতে জামেয়া কর্তৃপক্ষ ভিসা করিয়ে কাদিয়ানে আমাদের সাথে মিলিত হতে বলে।

আমরা ১লা নভেম্বর ২০১৬ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে দুইজন শিক্ষক ও সেই সাথে পাঁচজন ছাত্র দারুত তবলীগ কমপ্লেক্স থেকে পবিত্রভুমি কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ২ তারিখ সকালে আমরা যশোর বেনাপোলে পৌঁছাই। সকাল ৯টায় বর্ডারে পুলিশ ইমিগ্রেশন অফিসার সাহেব দুই ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখানে তার সাথে এক ঘন্টা তবলীগ হয়। অতঃপর আমরা সেখান থেকে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে বাসে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

কলকাতা

রাত ৭টা ৩০ মিনিটে আমরা কলকাতায় অবস্থিত আমাদের আঞ্জুমানে পৌঁছাই। অতঃপর ৩ তারিখ সকালে দিল্লি যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটা হয়। সেই দিনই দিল্লি থেকে কাল্কা যাওয়ার টিকিট এবং অমৃতসর থেকে কলকাতা ফেরৎ আসার অগ্রিম টিকিট কাটা হয়। এরপর বিকালে কলকাতা শহরের

বিভিন্ন জায়গা ঘুড়ে দেখি এবং অনেকে কিছু কেনাকাটাও করে। পরদিন ৪ তারিখ শুক্রবারের দিন হওয়ায় সকালে কলকাতা সাইন্স সিটি দেখতে যাই। জুমআ'র নামায পড়ে খাওয়া-দাওয়া করে আমরা শিয়ালদাহ স্টেশনে পৌছি। সেখান থেকে ৪.৩০ মিনিটে রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এই ট্রেন অত্যন্ত বিলাশবহুল যেখানে থাকা ও খাওয়ার মান অনেক উন্নত।

দিল্লি

দিল্লি মিশন হাউজে আমরা ৫ নভেম্বর দুপুর ১.৩০ মিনিটে পৌছাই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দিল্লি লাল কেল্লায় যাই। এবং সন্ধ্যায় মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে প্রতিবেদন 'সাউন্ড এন্ড লাইট শো' উপভোগ করি। অত:পর রাত ৯টায় মিশন হাউজে পৌছাই। রাতে খাবারের সময় ছাত্রদের মধ্যে একজন বাবুর্চিকে বলেন, ভাই মরিচ আছে? তখন বাবুর্চি আমাদের জন্য শুকনো মরিচ নিয়ে আসলো। তাকে বলতে হত, হারি মরিচ; অর্থাৎ কাঁচা মরিচ। ৬ নভেম্বর আমরা ফজরের নামাযের পূর্বেই প্রাইভেট কারে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটি 'আগ্রার তাজমহল' দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে আমরা প্রথমে মথুরা যাই যা শ্রী কৃষ্ণের জন্মস্থান। এই মন্দিরের পাশেই মোঘলদের বানানো একটি খুব সুন্দর মসজিদ অবস্থিত। সেখান থেকে আমরা উত্তর প্রদেশের শেষ সীমানা 'ফতেহপুর সিকরি' যাই। অতঃপর দুপুর ২টায় আগ্রায় পৌছাই। এবং আমরা ফরেইনার কোঠায় টিকিট কেটে তাজমহলে প্রবেশ করি। আর এই তাজমহলের অপরুপ সৌন্দর্য্যের কারণে এটি আজ বিশ্ববিখ্যাত। এখানে অনেক সময় লেগে যাওয়ায় আমরা 'আগ্রার লাল কেল্লা' দেখতে পারিনি। ৭ তারিখ আমরা গালিবের মাযার যিয়ারত করি। এরপর দিল্লি শাহী জামে মসজিদে যাই। এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একবার আহলে হাদিসের অনেক বড় বড় মৌলবীর সঙ্গে বাহাস করেছিলেন। দিল্লিতে সবচেয়ে অবাক করার মত বিষয় লেগেছে পাতাল মেট্রো রেলের ভ্রমন। এই মেট্রো রেলের স্টেশনসমূহ মাটির নিচে তিন-চার তলা গভীরে অবস্থিত। রাত ৯টায় মিশন হাউজে পৌছি। ৮ তারিখ সকালে নাস্তা করে আমরা প্রাইভেট কারে দিল্লির প্রায় সব দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখি। ভারতের রাজধানী দিল্লির ইতিহাস খুবই প্রাচীন। সেইদিন আমরা প্রথমত কুতুবমিনার এরপর হুমায়ুন টম্ব, লটাস টেম্পল, নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাযার, পুরান কেল্লা, দিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়াম, রাষ্ট্রভবন, সংসদ ভবন এবং ইন্ডিয়ান গেইট প্রভৃতি স্থান ঘুরে দেখি। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো দেখতে সারাদিন লেগে যায়। ঐ দিন রাতে আমরা শিমলার নয়নাভিরাম অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য কাল্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ট্রেনে এক ব্যক্তির কাছে জানতে পারি যে, মোদী সরকার ৫০০ এবং ১০০০ রুপির নোট বাতিল ঘোষণা করেছে। আমরা সবাই অনেক চিন্তিত হই কারণ সবার কাছে এই নোটগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল।

শিমলা

অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভুমি শিমলা। দিল্লী থেকে শিমলার দূরত্ব ৩৮০ কি.মি.। শিমলা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। ৯ তারিখ সকাল ৫.৩০ মিনিটে দিল্লী থেকে কালকায় পৌছাই। কাল্কা হতে শিমলার দূরত্ব ৯০ কি.মি.। আমরা টয় ট্রেনের মাধ্যমে শিমলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এই টয় ট্রেন ১৯০৬ খ্রি. সালে ইংরেজ শাসনামলে চালু হয়। অবশেষে আমরা টয় ট্রেনের মাধ্যমে ৮০৬ টি ব্রীজ এবং ১০৩ টি টানেল অতিবাহিত করে দুপুরে শিমলায় পৌছি। হোটেলে পৌছার জন্য ভারী ব্যাগ নিয়ে পাঁয়ে হেঁটে রওয়ানা হই। ব্যাগ নিয়ে উঁচু উঁচু পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। অবশেষে একজন কুলি নেওয়া হয়। আমরা সেখানে হোটেল 'আমর প্যালেস' এ অবস্থান করি। বিকেলে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা শিমলা শহরটি ঘুরে দেখি। আমাদের হোটেল অনেক উঁচুতে হওয়ায় রাতে খাবারের পর হোটেলে ফিরে আসতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। ১০ তারিখ সকালে প্রাইভেট কারে করে নার্কান্ডা যাই। আশেপাশে বিশাল বিশাল পাহাড় আর আমরা পাহাড়ের আঁচল দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছি। যাওয়ার পথে খোদা তা'লার সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে বেড়ে উঠা বড় বড় ঝাউ গাছের সবুজ দৃশ্য অবলোকন করি। এটি এক অসাধারন অনুভূতি। অতঃপর আমরা নার্কান্ডা থেকে `Hatu peak' সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় গাড়িতে করে আঁকাবাঁকা উচুঁ নিচু পাথরের রাস্তা বেয়ে উঠি। সেখান থেকে বিকালে শিমলায় ফিরে আসি। ১১ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তার পর ইন্ডিয়ান

৫০০ এবং ১০০০ রুপি পরিবর্তন করার জন্য ব্যাংকে যাই। সেদিনই শিমলা থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রার পালা। ব্যাংকে অনেক দেরি হওয়ায় আমরা টয় ট্রেনের টিকিট পাইনি তাই আমাদের স্ট্যান্ডীং টিকিট কাটতে হয়। ২ টা ৩০ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দেয়। ট্রেনে প্রচন্ড ভীড় ছিল, ভালোভাবে দাড়ানোর জন্যও জায়গা নেই। তাই একেতো মানুষের ভীড় ও অন্যদিকে শরীর ক্লান্ত থাকায় দুটি ষ্টেশনের পরেই আমরা ট্রেন থেকে নেমে পড়ি। এরপর সেখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া করে প্রাইভেট কারে কাল্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

অমৃতসর

শিমলা হতে অমৃতসরের দূরত্ব ৩৪২ কি.মি.। আমরা রাত ৮.৩০মি. কাল্কা থেকে আমবালা আসি। সেখান থেকে ১২ তারিখ সকাল ৭ টায় অমৃতসর পৌঁছি। এই সেই স্থান যেখানে ইতিহাসের করুন ও মর্মান্তিক হত্যাকান্ড ঘটে, যা 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড' নামে পরিচিত। অমৃতসরের দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিখদের স্বর্ণ-মন্দির। এই মন্দিরটি একটি বড় লেকের মাঝখানে অবস্থিত। এটি শিখদের প্রধান উপাসনালয়। স্বর্ণমন্দির এলাকার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সু-শৃঙ্খল এবং অনেক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন যা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে করা হয়। আমরা অমৃতসর থেকে সকাল ১০টায় প্রাইভেট কারে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে সকালের নাস্তা সেরে নেই। আমরা গাড়ি থেকে কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্ দেখতে পাই। কাদিয়ানের কথা আমরা সব সময় বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকায় পড়ে এসেছি এবং কাদিয়ানের দৃশ্য সব সময় এম টি এ তে দেখে আসছি কিন্তু এবারই প্রথম কাদিয়ানের সৌন্দর্যকে নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি সেই ইলহাম যা এরুপ ছিল "ইয়া'তিকা মিন কুল্লি ফাজজিন আমিক"। অর্থাৎ প্রত্যেক গভীর রাস্তা দিয়ে লোকেরা তোমার কাছে আসবে। এই ঐশী ইলহামের সাক্ষীস্বরুপ খোদাতা'লা আমাদেরকে কাদিয়ান দেখার তৌফিক দান করেছেন। (আমীন)

কাদিয়ান

১২ তারিখ শনিবার দুপুর ২টায় কাদিয়ান এসে পৌঁছাই এবং লঙ্গর খানায় অবস্থান করি। সেদিন কাদিয়ানের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং আসরের নামাযের পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে শীতের তীব্রতা অনেক ছিল। মসজিদে আক্সা এবং মসজিদে মুবারকের রঙ ও বার্নিশের কাজ চলছিল তাই নামায মসজিদে আক্সাতে হয়। কাদিয়ান হল সেই পবিত্র গ্রাম যেখানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর (আ.) সমাধি আছে। আমরা ১৩ তারিখ রবিবার ফজরের নামাজের পূর্বে বাইতুদ্‌দোয়া ও বাইতুল ফিক্‌রে নামায পড়তে যাই। ফজরের নামাজের পর জীবনে প্রথম বার খোদা তা'লার মাহবুব বান্দা ও নবী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কবর যিয়ারত করি। আমরা সবাই সেখানে আবেগ আপ্লুত হয়ে যাই। কাদিয়ান থেকে ফেরত আসার পূর্ব পর্যন্ত আমরা নিয়মিত বেহেশতি মাকবেরাতে যেতে থাকি। পরদিন সকাল ৯টায় আমরা জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানে যাই এবং প্রিন্সিপাল সাহেব-এর সাথে দেখা করি। জামেয়াতে ২৬ শে নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা তাই আমাদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। কাদিয়ান জামেয়াতে প্রথম দিনই অনেক ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়। দুপুর ১২ টার দিকে আমরা মোহতরম মোহাম্মদ হামীদ কাওসার সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। তিনি বর্তমানে দাওয়াতে ইলাল্লাহ দফতরের দায়িত্বে আছেন। তিনি বলেন, হিন্দুস্তানে নাযারাত দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র দুটি শাখা রয়েছে। একটি হচ্ছে উত্তরাঞ্চল এবং অন্যটি দক্ষিনাঞ্চল। সেদিন বিকেলে লঙ্গর খানার দায়িত্বে নিয়োজিত মুরুব্বী তাবরেজ আহমদ সাহেব আমাদেরকে কাদিয়ানের দারুল মসীহ্‌র পবিত্র স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরন দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে ঘুরিয়ে দেখান। কাদিয়ানের উল্লেখযোগ্য স্থান গুলো হচ্ছে মসজিদে মোবারক, মসজিদে আক্সা, ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে লাল কালির নিদর্শন বহনকারী কক্ষ, বাইতুদ দোয়া, বাইতুর রিয়াযত, গোল কামরা, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) যে কক্ষে জন্ম গ্রহণ করেন, মিনারাতুল মসীহ্, বেহেশতি মাকবেরাহ্, কুদরতে সানিয়ার বিকাশস্থল, মসজিদে নূর ও নূর হাসপাতাল ইত্যাদি। মসজিদে মোবারক সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি অনেক ইলহাম হয়েছে তন্মধ্যে একটি হল : মুবারিকুন ওয়া মুবারাকুন

ওয়া কুল্লু আমরিন মুবারাকিন ইয়ুজআ'লু ফিহি (তাযকেরাহ, পৃ. ১০৬)। অর্থাৎ এই মসজিদ বরকত দানকারী ও বরকত প্রাপ্ত এবং প্রত্যেক বরকত মন্ডিত কাজ এখানে করা হবে। জামেয়াতে আমরা ১৫ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস করি। প্রতিদিন ৫টি করে ক্লাস হয়। জামেয়ার ক্লাস আমাদের অনেক ভাল লেগেছে। বিশেষ করে কালাম ক্লাস করে সকলে অনেক উপকৃত হয়েছি। ১৫ নভেম্বর মঙ্গলবার জামেয়াতে যাওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম নাযেরে আ'লা কাদিয়ান মোহতরম এনাম গৌরী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদের নসিহত করতে গিয়ে বলেন- হুযুর (আই.)-এর বক্তৃতা সবচেয়ে বড় নসিহত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দারুল মসীহ্র উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে বেশি বেশি দোয়া করুন। এরপর নাযের তালিম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করি। সেদিন বিকেলে আমরা ইন্ডিয়ান রুপি পরিবর্তন করার জন্য স্টেট ব্যাংক অফ পাটিয়ালাতে যাই। মানুষের ভীড় বেশি হওয়ায় ৪০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি। অবশেষে ভিতরে প্রবেশ করার পর শুনি ব্যাংকের টাকা শেষ হয়ে গেছে। ব্যাংকের ভিতর থেকে দরজায় তালা থাকায় আমরা ভিতরেই ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকি। ২০ মিনিট পর তালা খুলে দিলে আমরা ব্যাংক থেকে বেড়িয়ে আসি। এটি ছিল আমাদের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা।

কাদিয়ানের প্রোগ্রামে ১৬ থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত বুযূর্গদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা রাখা হয় । প্রথম দিন আমরা মোহতরম আব্দুল মুনিম সাহেবের সাথে মসজিদে আক্সাতে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদেরকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, একজন মোবাল্লেগ এর অস্ত্র হল দোয়া। নবী যখন দুনিয়াতে আসেন তার কোন অস্ত্র থাকে না। কেবল খোদা তা'লাই তাঁর অস্ত্র হন। যে কথা আপনি বলবেন তার উপর সর্বপ্রথম নিজে আমল করবেন। কাদিয়ানে তখন শীতের মৌসুম থাকায় আমাদের খাওয়া দাওয়া অনেক ভাল হয়। ১৮ তারিখ শুক্রবার সকালে আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মায়ের কবর যিয়ারত করি। সেদিন-ই কাদিয়ানে প্রথম জুমুআ'র নামায আদায় করি। ২০ তারিখ রবিবার যোহরের নামাজের পর মসজিদে নুর ও মসজিদে মাসরুর পরিদর্শন করি। মসজিদে নুর যেখানে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর আমরা আহমদী মহল্লা 'কোঠি দারুস সালাম' যাই। সেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মেয়ে সৈয়্যদা মোবারেকা বেগম সাহেবার বাড়ি দেখি। এই বাড়িতেই হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। এখানে বর্তমানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা চালু আছে। এই প্রদর্শনী আসরের নামাজের পরে উন্মুক্ত থাকে । সেখানে এক জন আহমদী ভাই হাফিজ সাহেবের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি ১৯৯১ সালে খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর এবং ২০০৫ ও ২০০৮ সনে খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর দেহরক্ষী ছিলেন। তিনি আমাদেরকে অনেক ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনান। যা শুনে আমাদের প্রত্যেকের নয়ন অশ্রু-সিক্ত হয়েছে। সেই দিন মাগরিবের নামাজের পর একজন বুযূর্গ মোহতরম জাফর আহমদ খাদেম সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাদেরকে ওয়াকফের গুরুত্ব সম্পর্কে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, ওয়াকফে জিন্দেগীর মানে হচ্ছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়া। যে খেদমতই করবেন তা খোদাকে খুশি করার জন্য করবেন। জামাতের সেবা অন্যকে খুশি করার জন্য করবেন না। অন্যকে খুশি করার জন্য করলে এটি শির্ক হয়ে যায়। আর শির্ক হলে সেই কাজে বরকত থাকে না। ২২ তারিখ বৃহস্পতিবার বই ক্রয়ের জন্য আমরা নাশ্র ও ইশায়াত দপ্তরের লাইব্রেরীতে যাই এবং প্রত্যেকেই অনেক রকম বই কিনি। বইয়ের মাঝে রুহানী খাযায়েন, তফসীরে কবীর, তফসীরে সগীর, মালফুযাত, এবং আনোয়ারুল উলুম উল্লেখযোগ্য। নাশ্র ও ইশায়াত দফতরের গাড়ি আমাদেরকে বই পুস্তক সহকারে লঙ্গর খানায় পৌঁছে দেয়। কাদিয়ানের জীবিত দরবেশগণের মধ্যে তিন জনের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। তারা হলেন দরবেশ আব্দুল কাদের সাহেব, দরবেশ খাজা আহমদ সাহেব, এবং বাঙালী দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেব। তাদের মধ্যে দরবেশ আব্দুল কাদের সাহেবের সাথে ২৪ তারিখ সাক্ষাত করার ২ দিন পর তিনি মারা যান। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার মৃত্যুতে আমরা অনেক শোকাহত হয়েছি।

লুধিয়ানা

২৭ নভেম্বর সকাল ১০ টায় আমরা লুধিয়ানা ও হুশিয়ারপুর এর উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমাদের সাথে গাইড হিসেবে ছিলেন

মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব। তিনি গাড়িতে বলেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কাদিয়ান শহরটি বিয়াস নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এর ফলশ্রুতিতে এখন দেখা যাচ্ছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এদিকে জমি ক্রয় করছে। লুধিয়ানা শহরেই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৮৮৯ সালের ২৩ শে মার্চ সুফি আহমদ জান সাহেবের বাড়িতে প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন। যে কক্ষে বয়াত নেয়া হয়েছিল তাকে 'দারুল বয়াত' বলা হয় । সেই ঘরে আমরা সকলে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করি। সেখানে তখন মেরামতের কাজ চলছিল।

হুশিয়ারপুর

হুশিয়ারপুর পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ শহর। কাদিয়ান থেকে হুশিয়ারপুর এর দুরত্ব ৭০ কিলোমিটার। এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ৪০ দিন চিল্লাকাশি করেন। এরপর তিনি এ শহর থেকে ১৮৮৬ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত বিখ্যাত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা হুশিয়ারপুর পৌঁছি। এখানেও মেরামতের কাজ চলার কারনে আমরা ইজতেমায়ি দোয়া করে চলে আসি। খুব বেশি অবস্থান করার সুযোগ হয়নি। এরপর রাত প্রায় ৮.৩০ মিনিটে হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানা ভ্রমণ শেষে আমরা কাদিয়ানে ফিরে আসি।

কাদিয়ানে অবস্থানকালীন আমরা ২৮ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দফতরে যাই এবং নাযের সাহেবদের সাথে সাক্ষাত করি। যেমন– নাযের ইসলাহ্ ইরশাদ, ইনচার্জ নুরুল ইসলাম, নাযের ইশায়াত, ওকালাতে ওয়াকফে জাদীদ, ওকালাতে তাহরীকে জাদীদ, দফতর বেহেশতি মাকবেরাহ প্রভৃতি। বিভিন্ন দফতরের নাযেরগণ আমাদের সাথে তাদের দাফতরিক কাজের নিয়ম-কানুন এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলেন। এছাড়াও আমরা ফযলে উমর প্রিন্টিং প্রেসে যাই। মোহতরম মুনির আহমদ হাফেযাবাদী সাহেব আমাদেরকে প্রেসটি ঘুরিয়ে দেখান। নাযেরে আ'লা সাহেব এবং জামেয়ার প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ডিসেম্বর শুক্রবার আমাদেরকে দাওয়াত করেন। কাদিয়ানে পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঙালির সাথেও আমাদের পরিচয় হয়।

কাদিয়ান থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা

৩ ডিসেম্বর শনিবার দুপুর ২ টায় আমরা কাদিয়ান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমাদের বিদায় জানানোর জন্য লঙ্গরখানায় অনেকেই উপস্থিত হন। আমাদের গাড়ি যখন কাদিয়ান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল তখন সবার হৃদয় খুবই ব্যাথিত ছিল। মনে শুধু এ কথাই নাড়া দিচ্ছিল যে, আমরা যেন নেয়ামত ও বরকতের মনিমুক্তো পিছনে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কাদিয়ানে প্রতিনিয়ত সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ আসছে এবং অনেকেই এখানে আসার জন্য অপেক্ষমান। আমাদের কি সৌভাগ্য! আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এই পবিত্রভুমি দেখার তৌফিক দান করেছেন। এরপর আমরা কাদিয়ান থেকে অমৃতসর আসার পথে শিখদের ধর্মীয় প্রসিদ্ধ স্থান 'ডেরা বাবা নানক' দেখে আসি যেখানে গুরুনানক সাহেবের চোলা বা পবিত্র পোশাক সংরক্ষিত আছে। 'ডেরা বাবা নানক' দেখার পর অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং বিকেল প্রায় পাঁচ টার দিকে রেল স্টেশনে পৌছি। অতঃপর রাত ১০ টা ৩০ মিনিটে ট্রেন 'হাওড়া এক্সপ্রেস' আমাদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ট্রেন অনেক লেট ছিল তাই আমাদের সময় বেশি লেগে যায়। ২ দিন ৩ রাত সফর করে ৬ই ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার সকাল ৫টায় আমরা হাওড়া স্টেশনে নামি। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে করে শিয়ালদাহ্ স্টেশনে যাই। শিয়ালদাহ থেকে ট্রেনে করে বনগা স্টেশনে আসি যা বাংলাদেশ বর্ডারের খুবই নিকটে। এরপর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কাজ শেষ করে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে সকলে নিরাপদে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। পরিশেষে এতটুকু বলতে চাই, কাদিয়ানের এই মুবারক সফর আমাদের জীবনের এক অসাধারন প্রাপ্তি যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে।

The Comforter has come: invitation to our Christian brothers and sisters

Abdul Awwal Khan Chowdhury
Muballigh In charge, Bangladesh

The greatest of all the prophets Hadhrat Muhammad(sa) was Rahmatul-lil-Alamin, which is 'A Great Mercy for the whole Universe'. He himself practiced this very spirit of Islam and has taught his followers to adopt the same. The Holy Quran, which was bestowed upon him, carries the basic teachings of universal brotherhood. Quran declares an unequivocal voice: 'Wa Im Min Ummatin Illa khala feeha Nazeer'(Al Fatir, verse 25), i.e "And there is no people to whom a Warner has not been sent" and also "Walaqad ba'asna fee kulli ummatir Rasula" (An Nahl, verse 37), i.e "And We surely did raise among every people a Messenger…". These holy verses clearly lay the foundation of universal fraternity by declaring that each and every nation has received divine messengers from Allah. All of them were from Allah and their messages were true in their origins. Islam also made it compulsory for every Muslim to believe in all the prophets sent by God, as it has been clearly mentioned in Surah Baqarah. A true believer has to declare openly 'La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, i.e, we do not differentiate between His prophets (as true messengers of God). The Holy Prophet of Islam Hazrat Muhammad(sa) has emphasized on peaceful and harmonious coexistence, despite the fact that every religion has its own religious stance and conviction.

On the year of 9th Hijra, a Christian deputation came from Najran to Medina to discuss the doctrinal differences between Islam and Christianity with the Holy Prophet of Islam(sa). The Holy Prophet(sa) not only welcomed them wholeheartedly but also permitted them to perform their religious rites openly and freely in the holy Mosque of Masjid-e-Nabawi itself, which is considered to be the most sacred mosque after the Holy Kaba! The Christian entourage debated for days with the Holy Prophet(sa) on the issue of trinity, a theory which is not accepted by Islam. Nevertheless, Huzur(sa) permitted them to present their point of view openly. He himself most somberly presented all the arguments and logics in favour of God's oneness, the Christians did not yield to leave their stance on trinity. At the end of the whole discussion, which lasted for days, the All-knowing Allah revealed the way towards the ultimate solution to resolve religious differences. In Surah Aal-e-Imran He revealed the divine teaching of 'Mubahala', that is a prayer duel by saying 'let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then we pray and we invoke Allah's curse upon the liars." (CH. 3: V. 61) .This is a spiritual duel among two parties to seek divine sign in favour of the people of right track. without jeopardizing the social peace and harmony. The ultimate sign would come from Allah. However, the Christian representatives did not participate in the spiritual duel despite the open invitation from our Holy Prophet(sa).

Following the footsteps of our beloved Master Hazrat Muhammad(sa) we continue to invite our Christian brothers towards the oneness of God. With all love and sincerity we request them to reconsider their stance on trinity by studying the Holy Bible thoroughly.

May we ask our Christian brothers to kindly ponder upon their belief regarding the crucifixion of Jesus? Death on cross meant an accursed death according to the Old Testament. It is clearly written "And if a man has committed a crime punishable by death and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the LORD your God is giving you for an inheritance." (Deuteronomy 21: 22-23). Can a person who loves Jesus and believes in him as a

beloved of God can even think for a moment that God would grant him an accursed death? We, Muslims, as the true admirers of Jesus cannot accept the story even for a second that Allah had casted His curse upon Jesus, who was appointed as His prophet!

Jesus was not God, nor was he the literal son of God. He used to pray to one Omnipotent God and his prayers were always heard or accepted. Just before his arrest by the Roman soldiers, he was constantly praying at the gardens of Gethsemane to Allah, whom he used to call his father and said, "O My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will, but as You will". (Mathew 26:39, Mark 14:36). A God himself will never bow down and pray to someone else. This verse proves thats, he was a servant and messenger of God. And furthermore, he was confident that his prayer would be heard, as Allah always used to accept his prayers. He has himself said, "…Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always: (John 11:41-42). And when he was put to cross he was surprised that his prayers were not apparently fulfilled, and thus he cried out in utter disbelief, "…Eloi, Eloi, lama sabachthani? (which is, being interpreted) My God, my God, why hast thou forsaken me?" So his prayers, his earnest supplications and humble submissions to One Omnipotent God clearly prove he was not but a humble servant of Allah. Our Christian brothers should ask, then why and in which sense was he called the son of God? The answer is given by Jesus himself."Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God." (Mathew 5:9). In this metaphorical sense was he called the son of God. Nothing else nothing more. He was a peacemaker, pure and simple. Christians should realize that their belief in the oneness of God will bring them closer to Islam and Judaism and all other divine faiths.

A neutral seeker of the truth among the Christians should also ask, what happened to the fulfillment of the famous prophecy repeatedly made by Jesus. In response to a demand from the opponents to show divine signs in his favor, Jesus said, "…An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas." (Mathew 12:39, Luke 11:29-30). What was the sign of Jonah? It was nothing but entering the belly of the whale alive, staying in there alive, and finally coming out of there alive. And this will be the exact scenario for Jesus Christ. He would enter the grave alive, remain there alive, and finally come out of the grave alive. This explanation was given by Jesus himself. " For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth." (Mathew 12:40).

Now Jesus was taken down from the cross within 3 to 4 hours of his hanging. A young man in his early thirties could not die on the cross in such a short span of time. Thus, he had to be alive, albeit in an unconscious state. He was put in a sepulchre. he was under treatment inside the sepulcher alive, and he came out of the sepulchre alive and went on his way to look for the lost sheep of Israel. This is the only logical explanation to the afore mentioned prophecy made by Jesus.

Our humble invitation remains open to the Christian brothers and sisters with all due sincerity and love. Please ponder upon these verses deeply and carefully. It was not Jesus who taught Trinity. None of the pure and original apostles of Jesus taught trinity. Rather it was Paul who later interpolated the the true teachings of Jesus and invented the dogma of Trinity. It is he who claimed, "And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain." (1 Coronthians 15:14). Our sincere and humble request to all our Christian brothers and sisters will be to leave the Pauline Christianity and adopt the original Christianity, which is nothing but the true explanation of the Old Testament. Jesus has himself prophesied regarding the advent of a Comforter. " And I will pray to the Father, and he shall give you another Paraclete (Comforter), that he may abide with you for ever;" (John 14"16). This permanent 'Comforter' has come in the divine personage of Hadhrat Muhammad(sa). Yes brothers and sisters of Christianity, we invite you to the world of peace, comfort and submission: Al-Islam.

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

NURUDDIN

নূরুদ্দীন

2017

Jamia Ahmadiyya Bangladesh

Masum Ahmed
Editor, Nuruddin
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
Phone: +88 01943373085, Fax: +88 02 7301854
e-mail: masum2084@gmail.com